রাজবন্দীর রোজনামচা

শহীদুল্লা কায়সার

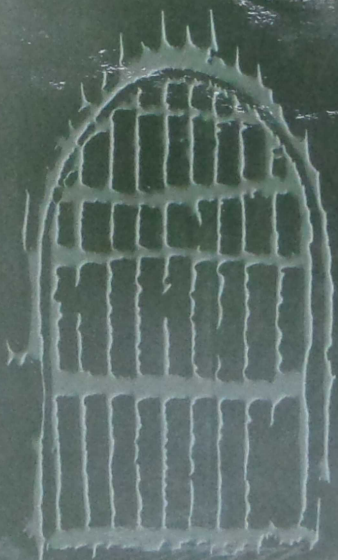

রাজবন্দীর রোজনামচা

শহীদুল্লা কায়সার

জোনাকী প্রকাশনী

গ্রন্থস্বত্ব ঃ পান্না কায়সার

জোনাকী প্রথম প্রকাশ ঃ অমর একুশে বইমেলা- ২০০০

প্রকাশক

মোহাম্মদ মুঞ্জুর হোসেন

জোনাকী প্রকাশনী॥ ৩৯/৪ নর্থব্রুক হল রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রচ্ছদ ঃ কাউম চৌধুরী

বর্ণ বিন্যাস ঃ

প্রগতি কম্পিউটার্স

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ঃ মুসা আর্ট প্রেস

৪১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৯০·০০

আট বছরের কারাজীবনে আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ
বেদনায় যারা ছিল নিত্যদিনের সাথী তাদের
হাতে তুলে দিলাম বন্দী-জীবনের রোজনামচা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অনুজ জহির রায়হান ডায়রি লেখার ফরমাশ জানিয়ে একখানা খাতা পাঠিয়েছিল জেলখানায়। সুদৃশ্য মলাট আর রঙিন কাগজ দেখে রীতিমতো যত্ন করেই খাতাটাকে তুলে রেখেছিলাম বেশ কিছুদিন। মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে মলাটের মসৃণতাটা অনুভব করেছি আর হয়ত টুকে রেখেছি দুচারটি টুকরো কথা, এঁকে রেখেছি– এক আধটি ছবির রেখা। রাজবন্দীর রোজনামচার এটাই হল উৎপত্তি।

কিন্তু এই উৎপত্তি থেকে রোজনামচা কখনো ছাপার অক্ষরে পরিণত রূপে আত্ম-প্রকাশ করতে পারত না, যদি না থাকতো কারাগারের সাথী সন্তোষ গুপ্তের অক্লান্ত শ্রম এবং বন্ধুসুলভ নিষ্ঠা। কাগজ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন সিদু ভাই। এদের দুজনের কাছেই আমি ঋণী।

আর একজন, এ পুস্তক প্রকাশে আমার মতোই আশা উৎকণ্ঠা উদ্বেগের যার অন্ত ছিল না, আমার কৃতজ্ঞতা তার অনভিপ্রেত। তাই নামটাও তার অনুক্ত থাকল।

শ. কা.

রাজবন্দীর রোজনামচা

শুরুর আগে

পৃথিবীর মাঝেই আর এক পৃথিবী।

এদেশের মাঝেই আর একটি দেশ।

নাম তার অচলায়তন।

রাজধানীর পথে চলতে চলতে হয়ত চোখে পড়েছে আপনার সেই উঁচু প্রাচীর। কোথাও তার উচ্চতা চৌদ্দ ফিট, কোথাও বা বিশ ফিট। আর নিশ্চয় চোখে পড়েছে বিশাল সেই লৌহ কপাট, কালো কপালে যার সাদা অক্ষরের ইংরেজী ঘোষণা, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল।

দেশের আর আর সব প্রশাসনিক বিভাগের মতই এখানেও রাষ্ট্রভাষা চালু হয়নি আজো।

এ প্রাচীরের উপর চোখ পড়ে আপনি কি কখনো থমকে দাঁড়িয়েছেন? থমকে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছেন ব্যর্থ প্রতিবাদে গুমরে ওঠা কোন কান্না? শুনতে পেয়েছেন ধুক ধুক কোন প্রাণের স্পন্দন? থমকে দাঁড়িয়ে আপনার কি মনে হয়নি, পাষাণ দেয়ালের নিরন্ধ্র বুকেও কত কথার আকুতি?

হয়ত এ প্রাচীর, আড়াআড়ি পুরু পুরু লোহার পাত, মোটা মোটা লোহার শিক– সেই কঠিন নিগড়, এ সব চোখেই পড়েনি আপনার। আপনি থমকে দাঁড়াননি। আপনি শোনেননি দেয়ালের কাহিনী। আপনি পাশ কাটিয়ে গেছেন।

কিন্তু আপনি পাশ কাটিয়ে গেলে অথবা চোখ বুজে থাকলেই কি এই লৌহ নিগড়ের অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায়?

যায় না। কেননা এই রাজধানীর কেন্দ্রস্থলেই তার সদর্প অস্তিত্ব।

একদিকে চকবাজার, দেওয়ান বাজার, অপরদিকে উর্দু রোড, পেছনে বক্সী বাজার– চতুর্দেয়ালে ঘেরা খুদে এ জগৎটাই আমার অচলায়তন। এখানে যারা বাস করে তারাও মানুষ। কেউ কয়েদী, কিছু বা রাজবন্দী।

জীবন এখানে স্থবির। নিঃশ্বাস এখানে যন্ত্রণা। এখানে অন্ধ দেয়ালে শূণ্যতার আর্তনাদ। এখানে সভ্যতা মৃত। অসীমের যাত্রী মানুষ, মানব অভিযাত্রার এ নাকি তার মধুরলতম লগ্ন। কিন্তু অচলায়তনের দেশে সে তো শুধুই পরিহাস।

অসহ্য! এ ভাবে বাঁচা যায়? নির্দয় ওই দেয়ালগুলোকেই যেন শুধায় খলিল। চিরকালের অসহিষ্ণু হাসিব। চেঁচিয়ে ওঠে ওর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ, একি বাঁচা? এতো মৃত্যুই। তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মরে যাওয়া। এই মরে মরে বাঁচার কোন অর্থ হয়?

কিন্তু হাসিব ভাই, ভয়ে ভয়ে বলে মন্টু, এ জীবনকেই তো সার্থকতার জীবন বলে বেছে নিয়েছি আমরা।

মন্টুর কথাটা শেষ হতেই খিঁচিয়ে ওঠে হাসিব, সার্থকতা? কিসের সার্থকতা?

তোমার ত্যাগের, তোমার কর্মের!

ধারে কাছে দেখছ এমন সম্ভাবনা? মুখ ভেংচায় হাসিব। বলে আবার, আমার তো মনে হয় সার্থকতার দিন কেবলই পিছিয়ে চলেছে আমাদের।

মুখ টিপে টিপে হাসে কালাম। জানে এত যে কথার ফুলঝরি ওদের, আসলে এসব কথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেনা ওরা। এ হল বন্দীজীবনের অর্থহীন ক্ষোভ। হেসে হেসেই বলে কালাম। না ভাই, সার্থকতার কথাটা অমন করে ভেবনা তোমরা।

কালামের কথায় সবগুলো চোখ বুঝি ছেঁকে ধরে ওকে।

কেন নয়, কেন নয়?

গীতার ভাষ্য দিয়ে কালাম বলে, কাজ করে যাও, ফল চেও না। ফলের জন্য লালায়িত হয়োনা। কেননা কর্মই মোক্ষ, কর্মই মুক্তি।

আপন মুসলমানিয়ানা সম্পর্কে সদা-সজাগ মান্নান। ও তক্ষুনি প্রতিবাদ করে। এ ভুয়ো দর্শন গিলতে রাজি নই। মুসলিম মানসে নিষ্কাম কর্মের স্থান নেই। থাকলেও অতি নগণ্য। আমার রসুল সারা জীবন লড়াই করে গেছেন, ফল চেয়েছেন, ফল পেয়েছেন। আমিও ফলের প্রয়াসী।

খলিল বলে অন্য ভাবে, একটুখানি খোঁচা দিয়ে। আসল কথা কী জান, কালাম ভাই? তোমার যে কন্টকশয্যা, তুমি মনে কর তাই তোমার ফুলশয্যা। তুমি মহান, অতএব এমন মনে করা তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু আমি? কন্টক শয্যার হাজার কন্টক অহর্নিশ বিধেঁ চলেছে আমায়। কাটায় কাটায় আমি ক্ষতবিক্ষত, আমার কলজে ছিঁড়ে শুধু রক্ত ঝরে। আমি পেতে চাই। আমি চাই ফুলের শয্যা। আমি চাই সাফল্যের শিখরে জয়ের মালা। আমি চাই সার্থকতা।

এমনি কত তর্কই না হয় এখানে। বন্দীশালার অফুরন্ত অবসর। তাই বিরাম নেই তর্কের।

শুধু একজন যোগ দেয়না কোন তর্কে। বয়স ওর সবে একুশ। কিন্তু বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত গম্ভীর এবং ভেতরমুখী স্বভাব বলে ওকে চটাবার জন্যই বন্ধুরা ওর নাম রেখেছে খোকা। কিন্তু খোকা চটেনা। তর্ক-বিতর্কের সব কিছুই শোনে। তর্ক শেষ হলে গান ধরে–

"যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়।
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে একলা দলোরে।"

একুশ বছরের জীবনে এই একটি মাত্র গানই শিখেছে খোকা। বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে এই একটি গানই শুনে আসছি ওর কণ্ঠে।

সময় এখানে জগদ্দল পাথর। পাথরের ভার হয়ে চেপে থাকে বুকের উপর। ওর যেমন স্বভাব, কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলে কালাম– আইনষ্টাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে– আইনষ্টাইন বলেছেন সময় ঘটনার সমষ্টি। এই কারাগারে ঘটনা নেই। রটনাও নেই। অতএব সময় স্তব্ধ, গতি রুদ্ধ।

কথাটা বলে চোখের ঠারে দুষ্টুমী খেলিয়ে হাসে কালাম।

কবি বলে, জানো? ওটা মেফিসষ্টোফেলিসের হাসি। পবিত্র মানবাত্মাকে নরকের পথে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে মেফিষ্টোফেলিস নাকি এমন করেই হাসত। কালাম আমাদের বিভ্রান্ত করছে। সাবধান তোমরা।

সবাই সটকে পড়ে। কেননা এটা স্পষ্ট, ভীষণ একটা তর্কের পাঁয়তারা করছে কালাম।

পায়চারী করছিলেন সেলিমভাই। কথাটা শুনেই থমকে দাঁড়ান। মাথা দুলিয়ে বলেন, উঁহু।

উঁহু কি? শুধায় কালাম।

মুখে কিছু না বলে বাগানের দিকে আংগুলের সংকেত উচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেলিমভাই।

বাগানের শেষপ্রান্ত যেখানে মাটি নেই, শুধু ইঁটের গুড়ো আর নুড়ি পাথর সেখানে লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে অপরাজিতার লতা। সেদিকে তাকিয়ে কি এক মেদুর নমনীয়তায় আর্দ্র হয়ে আসে সেলিম ভাইর চোখ-জোড়া।

হঠাৎ বলে উঠলেন সেলিম ভাই, দেখছো না? পাথুরে রুক্ষতার মাঝেও কেমন স্নিগ্ধতনু অপরাজিতার লতা? সবুজ বিথারে নীল-চক্ষু স্বপ্ন মেখে কী স্পর্ধায় আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছে, দেখছো না?

হ্যাঁ দেখছি।

তবে? তবে কেমন করে বলতে পার জীবন এখানে স্তব্ধ? শোন এই কারাগারেও রুদ্ধ নয়, গতিহারা নয় জীবন।

স্বভাবতই এই রুদ্ধকপাট শৃংখলিত জীবনের বিরাট অংশ জুড়ে রাজনীতি। রাজনীতি করেই এরা সব জেল খেটেছে অথবা খাটছে। কিন্তু রাজনীতি এ গ্রন্থের উপজীব্য নয়। দেয়ালে দেয়ালে গুমরে ফেরে যে বন্দী আত্মার ফরিয়াদ সেও আমার রচনার বিষয় নয়। রুদ্ধ হিয়ার বেদনা, বন্দীর কান্না, এসব নিয়ে সাহিত্য করার ধৃষ্টতা নেই আমার। আমার কাহিনী, কাহিনী নয় সামান্য আঁচড়– ত্যাগে মহিমায় যারা পেয়েছে দেশপ্রেমিকের গৌরব, অন্ধপ্রকোষ্ঠে অমিততেজ প্রাণের দীপ জ্বালিয়ে যারা করে জীবনের আরাধনা– তাদেরই জীবনের একান্ত একটি গৌণ দিক।

কেমন করে কাটে ওদের রুদ্ধ কারার দিন? কারাগারের হাজারো হাসিকান্না সুখদুঃখ মিলিয়ে যে বন্দীর জীবন এ রচনা তারী একটি আলেখ্য। ক্ষুদ্র এবং অপর্যাপ্ত।

পঁচিশে চৈত্র

এ্যা? একি টোষ্ট, না জুতোর সুকতল্লী? মানুষের খাবার না কি ঘোড়ার ফোডার? ঘোড়াও খাবে না। বলতে বলতে টোষ্ট দুখানি দরজা গলিয়ে বাইরের ড্রেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল খলিল। কাছেই কোথাও ওঁত পেতেছিল দুটো কাক। ছোঁ মেরে টোষ্ট দুখানি নিয়ে পালিয়ে গেল।

ওকি ফেলে দিলি? খাবি কি? ভাত তো আসবে সেই দুপুর একটায়। হাঁ হাঁ করে দৌঁড়ে এলেনে গ-দা। ওহে কালাম, খবর দে তো একটু চৌকোয়, দু-খানা বিস্কুট পাঠিয়ে দিক। ছেলেটা কি না খেয়ে থাকবে?

কালাম চায়ের পেয়ালাটা হাতে লয়ে চলে গেল দরজার দিকে, বুঝি চৌকোয় খবর দিতে।

না গ-দা, আমি খাবই না আজ। লাল মুখে উঠে থপ থপ করে বেরিয়ে গেল খলিল।

ছেলেটার মেজাজই বিগড়েছে আজ।

বিগড়োবেনা? গ-দার কথাটা শেষ হতেই ওদিক থেকে খেঁকিয়ে উঠল রশিদ। এই যে চা, একি চা? এ তো তেঁতুলপাতা সেদ্ধ, ওয়াক, মানুষে খায়। যেই বলা অমনি কাজ। কাপটা উপুড় করে সব চা-ই ফেলে দিল ও। তারপর পা-দুটা টান করে সটান হয়ে শুয়ে পড়লো খাটের উপর।

এই দেখো আর একজনের আবার মেজাজ বিগড়োলো, আরে ভাই অমন মেজাজ বিগড়োলে জেল-খাটা যায়? কিছুটা আদর কিছুটা শাসনের স্বরে বললেন গ-দা।

হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার মত ফেরেশতা হলে তো হয়েছিলো। কে যেন খিঁচিয়ে উঠলে।

ভর্তি চায়ের পেয়ালাটা যেমন ছিল তেমনি রেখে উঠে পড়লাম। সত্যি তো মেজাজের কী দোষ। মেজাজ তো অনেক সয়েছে। বদ্ধ জীবন। চারিদিকে নির্মম রুক্ষতা। শুধুই নিরানন্দ। নেই একটুখানি মমতার ছোঁয়া। আপনজনের পরশ। একটু স্নেহের হাসি। দুটো বা মিষ্টি কথা। তবু, তবু মেজাজ বিগড়োলে চলবে?

আরে ভাই, এ বড় কঠিন ঠাঁই, ভেতর থেকে শুনি গ-দা বলছেন। যেন আপন মনেই বলছেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই, ভাই এ বড় কঠিন ঠাঁই।

আটাশে-চৈত্র

সত্যি বুঝি কঠিন ঠাঁই।

কঠিন ঠাঁই এ কারাগার।

গুমটি ঘরের পেটা ঘড়িতে এগারটা পিটিয়েছে, সেও অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এগারটা বাজার সাথে সাথেই রেগুলেটারের সুইচ টিপে ঝিমিয়ে দিয়েছে ঘরের বিজলি আলো। তেল শুকিয়ে যাওয়া লণ্ঠনের ফিতের মতোই টিম টিম করে জ্বলছে সিলিংয়ের লাল বালব্‌গুলো। এতে আলো হয় না। শুধু অন্ধকারটাকেই সরিয়ে রাখে, আর সিকিউরিটি ওয়ার্ডময় ছড়িয়ে থাকে কোন অসুস্থ মুখের পাণ্ডরতার মত এক ধরনের ফিকে বিবর্ণতা। এই ফিকে বিবর্ণতায় ঘরের মানুষগুলোকে ঠিক ঠিক চেনা যায় না। কিন্তু বোঝা যায় এবং দেখা যায় কে শুয়ে আছে, কে বসে আছে, কেইবা হাঁটছে। কারা কানুনের অবশ্য পালনীয় ধারা মতে এই বোঝা-যাওয়া এবং দেখা-যাওয়াটা প্রয়োজনীয়। নইলে বাইরে পাহারারত সান্ত্রী কেমন করে বুঝবে কোনো সিকিউরিটি সাহেব রাতের সুযোগে গরাদ ভেংগে পালিয়ে যায়নি?

কোনো মানে হয়না এ সতর্কতার, একেবারে ফজুল। কোন এক রাতে তেসরা পাহারার কোন এক মিঞাসাহেব অর্থাৎ সিপাইজীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম কথাটা। জানালায় দরজায় এমন মোটা মোটা লোহার শিক, চারিদিকে পুরু আর উঁচু উঁচু দেয়াল। শুধু কি একটি দেয়াল? দেয়ালের পর দেয়াল। তার উপর পদে পদে আপনাদের সতর্ক পাহারা। তার উপরও ঘরের বাতিটা ডিম করে হলেও জ্বালিয়ে রাখতে হবে? পহরে পহরে গুণতি মিলোতে হবে? এর নাম বাড়াবাড়ি।

কথাটা বলার অবকাশ হয়েছিল কেননা সিপাইজী প্রতি জানালায় উঁকি মেরে মেরে ওই ফিকে আলোয় ঘুমিয়ে বা বসে থাকা মানুষগুলোকে একটি একটি করে গুণছিলেন। রাতের গুণতিটা দুবারেই সারা হয়। সন্ধ্যায় লক-আপের সময় আর ভোরে যখন খুলে দেওয়া হয় লক-আপ। কিন্তু রাত বারটায় মাথা গোনার ব্যাপারটায় অভ্যস্ত নই, সচরাচর এটা হয়নি। তাই মনে মনে একটু তেতে উঠেছিলাম।

আমার কথা শুনে বিজ্ঞের মতন মুচকি হেসেছিলেন সিপাইজী। যেন বলেছিলেন, মুখে তো সায়েব বাতচিত মেলাই করলেন, কিন্তু মনে কি যে ফন্দি সে খবর কেমন করে জানব?

যা সচরাচর ঘটে না তেমন ব্যাপার দেখে কৌতূহলী হয়ে দেয়াল সিপাইটিও এগিয়ে এসেছিলেন। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলেছিলেন, আরে না না এঁরা হলেন গিয়ে সব এম, এ, পাশ বি, এ, পাশ ভদ্রলোকের ছেলে, এরা কখনো পালাতে পারেন? পালাবেন না।

খুবই যুক্তিসংগত কথা। মিঞাসাহেবের গলায় হাঁ মিলিয়ে বললাম ঠিকই তো, ভদ্রলোকের ছেলে পালাবে কেন?

আর সেই সময়ই বুঝি পাশের সীটে ঘুম ভেঙ্গে গেছিল মন্টুর। মশারির ভেতর থেকে মুখ বের করে শুধিয়েছিল, সিপাইটা কী বলল হামেদ ভাই? আমরা সব ভদ্রলোকের ছেলে, তাই না? উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে মুখটাকে তখনি আবার মশারীর ভেতর টেনে নিয়েছিল মন্টু।

কিন্তু কপাল মন্দ। এসব কথায় কান না দিয়ে আমাদের সিপাইজী এক এক করে পুরো গুণতিটা মিলিয়ে তবে থেমেছিলেন।

জানালার কাছে চেয়ারটা টেনে বসে আছি। রাত এগারোটা পেটানোর পর নিম-আঁধার নিম-আলোর পরিবেশে এমনি বসে থাকতে আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে কেননা দিনরাত্রির মাঝে এটুকুই মাত্র সময় যখন নিজেকে নিয়ে সুন্দর একটি নির্জনতার নীড় গড়তে পারি, একান্তভাবে নিজেকে নিয়ে বসে থাকতে পারি চুপচাপ। বুঝি নির্জনতার এই অবকাশটুকুর দিকে চেয়েই সন্ধ্যারাত্রিরা তর তর করে কেটে যায় আমার। টের পাই না।

হ্যারিকেনটাকে তিনপাশ থেকে কাগজের বোরখা পরিয়ে জেগে আছে কবি। রাত দেড়টা দুটোর আগে কচিৎ ঘুমোয় ও। জেগে জেগে লেখে অথবা পড়ে। কবি ছাড়া অন্যরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ সময় ঘরটার ভেতর তাকিয়ে মনে হয় মশারিগুলো যেন সিন্দুকের সারি, কে যেন সারি সারি সাদা সিন্দুকে ভরে রেখেছে ঘরখানা। খস খস লিখে চলেছে কবি, যতই গভীর হচ্ছে রাত ততই যেন লেখার তোড় বেড়ে চলেছে ওর। বাইরে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। জমাদার এসে হাজিরা খাতায় সই নিয়ে গেছে। অতএব সিড়ির উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম পেড়েছে তেসরা পাহারা। অদূরে এক ঝাঁক নীরবতা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে নিম গাছটা। গরাদ সমান আকাশটা কালোনীল।

সেখানে ইতস্তত কয়েকটি তারা। ওদের কোন তাড়া নেই। যার যেমন ইচ্ছে বসে রয়েছে। বসে আছে তো বসেই আছে। আর পিট পিট চোখে দেখছে বহুদূরের এই পৃথিবীটাকে।

গরাদ সমান ওইটুকু আকাশ আর এ কয়টি তারা। এদের সাথে নিবিড় এক সখ্য সম্পর্ক আমার। মাসের ওপর মাস জমে বছর হয়েছে। একে একে বছরগুলো কেটে গেছে। পৃথিবীর নিত্য আবর্তনে, উত্থান পতনে কত পরিবর্তন এসেছে মানুষের জীবনে। কিন্তু আকাশের ওই কটি তারা আর এই গরাদে বন্দী আমি, কোন প্রলয়ই স্থানচ্যুত করতে পারেনি আমাদের। আমরা যেমনটি ছিলাম তেমনটিই রয়েছি। স্থির অনড়। পরস্পরকে শুধু নিঃশব্দে দেখা, শুধু দৃষ্টি বিনিময় দিনের পর দিন, এমনি করে অদৃশ্য সুতোর কি এক মিলন গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেছি আমরা।

একেবারে পুবদিকের দেয়াল ঘেঁসে খলিলের সীট। হঠাৎ দেখি মশারি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ও। মশারির ঝুলটা গুটিয়ে এসে বসলো আমারই পাশে। আমিও ইনসোমেনিয়ার রোগী তাই গলায় দরদ ঢেলেই শুধালাম, ঘুম হচ্ছেনা বুঝি?

না। কারো উপর যেন ভীষণ ক্রুদ্ধ তেমনি করেই এক অক্ষরের উত্তরটিতে একরাশ উষ্মা ঢেলে দিল খলিল।

আমার কাছে স্লিপিং পিল আছে। খাবে একটা? হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে নিতে যাচ্ছি বড়ির শিশিটা। কিন্তু বাধা দিল খলিল। বলল, না দরকার নেই। ঘুমোবার বিশেষ ইচ্ছেও নেই আমার।

ইচ্ছে নেই? অবাক হয়ে তাকাই ওর দিকে।

জানেন হামেদ ভাই কি ইচ্ছে করে আমার?

নীরব থেকে কথাটা শেষ করতে উৎসাহ দেই ওকে।

আমার ইচ্ছে করে এই যে দেখছেন মোটা মোটা লোহার শিক, এগুলো দুমুড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেই। ছুটে যাই সেখানে যেখানে নেই গরাদের নিষেধ, যেখানে তেপান্তরের মাঠ, শুধু মাঠ আর মাঠ। যেদিকে খুশি, যতদূর খুশি, আমি চলতে পারি সে মাঠের ঢেলা ভেঙ্গে, আলে চড়ে। কেউ বলবে না, এই ইধার মৎ যাও।

সর্বনাশ! এই গভীর রাত্রে এমন 'ধংসাত্মক' প্রবণতা পেয়ে বসল তোমাকে? কি করা যায় এখন? ঠাট্টার সুরেই বললাম।

না না হামেদ ভাই, হাসি নয়। সত্যি বলছি এমন একটা চিন্তা বিশেষ করে রাতের বেলায় আমাকে যেন পেয়ে বসে। ভেতরে ভেতরে দুর্নিবার এক আক্রোশে অস্থির হয়ে উঠি আমি, ইচ্ছে জাগে ছুটে যাই এই গারদ ভেঙ্গে সুমুখের ওই দেয়াল গুঁড়িয়ে। ওই দেয়ালগুলো কেন অমন পথরোধ করে দাঁড়াবে? দেখছেন না শুধু প্রাচীরের পর প্রাচীর! কেন, কেন এতো প্রাচীর? ওই দেখুন দেয়াল সিপাইটা কেমন গলা বাড়িয়ে লক্ষ্য করছে আমাদের। ভাবছে না জানি কি গোপন শলা করছি আমরা। কিন্তু কেন, কেন ও ব্যাটা অমন করে তাকাবে আমাদের দিকে?

ও থামতেই বললাম এতো আরো সর্বনেশে ইচ্ছে। দেয়ালে মাথা কুটবে নাকি?

হোক মাথা কোটা, তবু সেও তো একটা-কিছু-করা। নইলে এমনি ধুঁকে ধুঁকে–। বাক্যটা শেষ না করেই থেমে গেল খলিল।

দেয়াল সিপাইটার বুঝি ঘুম পেয়েছে। ঘুম তাড়ানোর জন্য জোরে জোরে হাঁটছে বেচারি। আর ওর বুটের আওয়াজটা দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে দ্বিগুণ শব্দমান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা সিকিউরিটি ওয়ার্ডে, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

চুপ করে বসে আছে খলিল। এমনি স্বভাব ওর। যখন কথা বলে ভীষণ জোর আর আবেগের তীব্রতা ঢেলেই বলে। মনে হয় বলার সাথে সাথে নিংড়ে নিংড়ে বের করে দেয় ভেতরের সম্পূর্ণ হৃদয়টা।

পরমুহূর্তেই একেবারে নির্বাক। বললাম এবার শোয়া উচিত।

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল খলিল।

বাতাস বইছে ঝির ঝির। আমার মনে হল, গারদ পরিমাণ আকাশের সেই তারা কয়টি সহসা যেন চোখ নাচিয়ে কেঁপে গেল। একটুখানি কেঁপেই স্থির হল আবার। আকাশের তারা কি কখনো পৃথিবীর বেদনায় অমন করে কাঁপে?

বাংলাদেশ
শাহবাগ, ঢাকা।

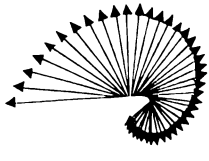

তিরিশে চৈত্র

প্রাচীরের ওপার থেকে কুণ্ডুলী পাকিয়ে পাকিয়ে দৌড়ে আসে চৈতালী ঘুর্ণি। সঙ্গে করে কতকী যে নিয়ে আসে– শুকনো পাতা, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, তুলোর বীচি, পাখীর পালক আর যতো রাজ্যের ধুলো-বালি। খটাখট বন্ধ হয়ে যায় সবগুলো জানালা। কিন্তু কবির জানালাটা খোলা। ফাঁক পেয়ে হুড় হুড় করে ঢুকছে রাশি রাশি ধুলোবালির কণা। ওদিক থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন অ-দা। ওহে এক কাঠি রোদ্দুর কষ্ট করে একটু ওঠো। জানালাটা বন্ধ করো। ঘর যে ভরে গেল ধুলোয়।

এক কাঠি রোদ্দুর অর্থাৎ কবি ঘাড়টা বেঁকিয়ে একবার দেখল, বলল, উঁহু এ ধুলো জনপদের ধুলো। আসুন গায়ে মেখে পবিত্র হই।

কেন যেন কবির স্বরটা আজ পরিহাসের নয়। অ-দা সেটা লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য করেই চুপ করে গেলেন। এমনিতে চুপ করে যাবার লোক নন অ-দা, বিশেষ করে কবির ক্ষেত্রে। বছর আড়াই হল বয়স তাঁর ষাট অতিক্রম করেছে। ষোল বছর বয়স থেকেই এই শ্রীধামে তাঁর যাতায়াত। কিন্তু এই বয়স অথবা দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা কোনটাই কেড়ে নিতে পারেনি তাঁর স্বভাবের তারুণ্য। কবির মতন তরুণ বয়সীদের পেছনে সারাক্ষণ লেগেই থাকেন। খেলার মাঠে অথবা খাওয়ার টেবিলে বিলিয়ে চলেন সদা-উৎফুল্ল মুখের অফুরন্ত হাসি পরিহাস। তরুণদের ভেতর কবির, মতন খলিল আর কাসেমও তাঁর প্রিয়পাত্র।

খলিল এতক্ষণ পুরনো চিঠির বোস্তানীর ভেতর ডুবে ছিল। সন তারিখ মিলিয়ে নানাজনের চিঠি নানা ভাগে ভাগ করে রাখছিল। আর মাঝে মাঝে সুমুখের খোলা খাতাটায় কি যেন টুকছিল। বাতাসে এলোমেলো করে দিচ্ছিল ওর চিঠি। বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে ভাগ এবং ভাঁজ-সারা চিঠিগুলো বালিস চাপা দিয়ে নিজের কাজটাই করে যাচ্ছিল এতক্ষণ। কিন্তু অ-দার উত্তরে কবির কথাগুলো শুনে আড়চোখে ওকে একবার দেখল খলিল। বলল, এই কবি হাওয়াতে উড়িয়ে নিল কাগজ পত্তর।

বালুতে কেমন কিচ কিচ করছে বিছানা বই-পুস্তক। জানালাটা বন্ধ কর না কেন?

কবি একমনে চৈতালী ঘূর্ণির খেলা দেখছে। খলিলের কথাটা আদৌ কানে না নিয়ে ওকে ডাকল, এস এদিকে এস। দেখে যাও। আহা চমৎকার। শুকনো শিউলি পাতারা কেমন নাচতে নাচতে দেয়াল টপকে রিলিজ হয়ে যাচ্ছে। দেখে যাও।

চিঠির সাজি ছেড়ে উঠে এল খলিল। কিন্তু ঘুর্ণি দেখবার জন্য নয়, কপাটগুলো বন্ধ করার জন্য। কবির বিমূঢ় চোখের সম্মুখে ঠাস করে কপাটজোড়া বন্ধ করে নিজের বিছানাটায় ফিরে এল খলিল।

প্রমাদ গুণলাম। অতি সামান্য থেকে কতদিন কত দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে এখানে। এটাই তো স্বভাব কয়েদখানার। কিন্তু না, ততক্ষণে কালাম পৌঁছে গেছে কবির সীটে। ওর খাতা থেকে একটি কবিতা বের করে আবৃত্তি শুরু করেছে– আমার স্থপতি হৃদয় বষে বর্ষে কতনা পাথরে জীবন ঢেলেছে----- খলিলের উপর রেগে উঠবার আর অবকাশ পেলনা কবি।

স্পষ্টই দেখছি তবুও শুধালাম– খলিল, পূরনো চিঠি পড়ছ বুঝি?

নিরুত্তর খলিল নিজের কাজ করে চলেছে। কাছে এসে শুনলাম আপন মনে গজ গজ করছে, সবটাতেই খালি ফাজলামো। বুড়ো মানুষ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র অ-দা। তিনি বলছেন বন্ধ কর জানালাটা। তবু যদি কানে লয় কথাটা।

বুঝলাম চটার ভাবটা ওর স্তিমিত হয়নি এখনো। বসলাম ওর খাটের কিনারে। আবারও শুধালাম, বৌর চিঠি পড়ছ বুঝি?

এবারও আমার প্রশ্নটার কোন উত্তর না দিয়ে যেমন চিঠি বাছাই করছিল তেমনি বেছেই চললো খলিল। চেয়ে দেখলাম মোসাম্মৎ তাহমিনা বেগমের চিঠিগুলোই বিশেষ ভাবে আলাদা করে রাখা। সংখ্যার দিক থেকে এ ভাগটাই স্ফীততর।

সরকারী অফিসারের মেয়ে তাহমিনা বেগম। তাহমিনাকে বিয়ে করে ছয়টি মাস না যেতেই জেলে চলে এসেছিল খলিল। ওর গ্রেফতারের সময় তাহ্‌মিনা ছিল অন্তঃসত্ত্বা। জেলে আসার পাঁচ মাস পর তাহ্‌মিনার কাছ থেকে ফুটফুটে একটা ছেলে উপহার পেয়েছে ও। সেই ছেলে এক-সময় মায়ের কাছে থেকে বাপী ডাক শিখেছে। এখন শিখেছে হাঁটতে। খলিল হাসতে হাসতে বলে, বুঝলে হামেদ ভাই, ছেলে এবার লেখাপড়া শিখে বাপকে চিঠি লিখবে জেলে। তার পর 'বাপীকো ছোড় দো' বলে মিছিল করবে রাজপথে, তখন যদি ছাড়া পাই। ও যেমন হাসতে হাসতে বলে তেমনি আমরাও শুনি এবং হাসি। কিন্তু এই হাসির

অন্তরালে কী যে গভীর বেদনা সে তো লুকানো থাকেনা কারো কাছে। বাছাবাছি শেষ করে খাতায় আবার কি যেন টুকে রাখল খলিল। তারপর পুরনো একখানা চিঠি খুলে নিয়ে পড়তে বসল। পড়ছে তো পড়ছেই, আমি যে বসে আছি ওর খাটে সেটা যেন লক্ষ্য করার সময় নেই ওর। এটা ওর রাগ প্রকাশের আর একটা পদ্ধতি।

চিঠির সাজি থেকে তাহ্‌মিনার একখানা চিঠি তুলে নিলাম হাতে। খামের হস্তাক্ষরগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে বললাম, তাহ্‌মিনার হাতের লেখাটা সত্যি সুন্দর! তাইনা খলিল?

এবার কপট মনোযোগ অথবা গাম্ভীর্য কোনটাই ধরে রাখতে পারল না খলিল। চোখের কোণ দিয়ে আমাকে একবার দেখল। হাসি-না-হাসি করে হেসেও ফেলল। বলল, যাই বলুন না কেন আপনি, কবিটা বড় বেয়াদব। হাজার ঠাট্টার সম্পর্ক হোক তবু অ-দা একটা কথা বলছেন সেটা মানবেনা? তা ছাড়া ধুলো আসছে এতে সবারই অসুবিধা।

বললাম যাক ও কথা। অ-দা কিছু মনে করেন নি।

নাইবা করলেন। তাই বলে আমরা মুরুব্বিজনদের একান্ত প্রাপ্য শ্রদ্ধাটুকুও দেবনা? বেয়াদবীটা আমি মোটেই সইতে পারিনা।

হাতে ধরে তাহ্‌মিনার চিঠিখানা নাড়াচাড়া করি আর যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করেছিলাম সে প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। বলি, শুধু হস্তাক্ষর নয় তাহ্‌মিনার লেখন ভংঙ্গিটাও চমৎকার।

নিজের বৌর কড়া সমালোচক খলিল। বৌ ওর কথা শোনেনা, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখে না, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করেনা। অহেতুক দুশ্চিন্তায় বাড়িয়ে চলে দুঃখের বোঝা। বৌর বিরুদ্ধে এমনি সব অভিযোগ খলিলের। কিন্তু সমালোচনা ওর যাই থাকুক পৃথিবীর সকল বৌ-অলাদের মতোই অন্যের মুখে বৌর প্রশংসা শুনতে পেলে অল্প হলেও খুশি হয় ও।

আজ খুশি হলনা খলিল। আমার হাত থেকে খামটা নিয়ে চিঠির ছোটবড় তাড়াগুলো পুরে রাখল বাক্সে। বন্ধ করে দিল বাক্সের ডালা।

ছোট ছোট বাক্যে মনের ভাবটাকে বেশ গুছিয়ে ব্যক্ত করতে পারে তাহ্‌মিনা, তাই না? আবারও সুখ্যাতি করে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কৃত্রিম অবরোধটা ভেঙ্গে গেল। ভক করে হেসে দিল খলিল। বলল সেই চিরনিন্দুকের

ভাষায়, এই মেয়েটা নিজেও মরবে আমাকেও মারবে। এই নিন্দাবাদের ধার দিয়েও ঘেঁসলাম না। শুধালাম, এতক্ষণ ওর চিঠি দেখে দেখে কি টুকছিলে?

টুকছিলাম না হিসেব করছিলাম।

কিসের হিসেব?

শুনবেন?

হ্যাঁ, বল না?

আজ তো বছরের শেষ! তাই গোটা বছরের হিসেবটা করে ফেললাম। সারা বছরে চব্বিশটা ইন্টারভিউ 'হক' ছিল। মানে আইন মোতাবেক পাওনা হয়েছিল। মারা গেছে চারটে। কিন্তু স্পেশাল ইন্টারভিউ পেয়েছি সাতটা। অর্থাৎ 'হক' আর স্পেল মিলে সারা বছরে সাতাশবার মোলাকাত হল বাড়ির লোকজনের সাথে। এর মাঝে ষোলটা ইন্টারভিউ বৌর সাথে।

হো হো করে হেসে উঠলাম ওর হিসেব শুনে। অদূরে দেশী বিদেশী আট দশ রকম খবরের কাগজের গাদার ভেতর ডুবে আছে মুরাদ। কখনো বা টুকছে কখনো বা ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাটিং কাটছে। সে সব কাটিং সেঁটে রাখছে ফাইলে। আমাদের মাঝে ও হল সংখ্যার রাজা। তথ্যে আর সংখ্যায় খাতার পর খাতা ভরে তুলছে ও। আমার হাসি শুনে পত্র-পত্রিকার গাদা থেকে মুখ তুলে একবার দেখল আমাদের। ওকে দেখিয়ে বললাম খলিলকে, তথ্যগুলো মুরাদকে দিও। ওর কাজে লাগতে পারে।

কারাগারে এই হিসেবের কায়দাটা খলিলের নিজস্ব। আমরা বলি একটা মাস চলে গেল। ও বলে দুটো ইন্টারভিউ হয়ে গেল। আমরা বলি চারমাস গেল। বছরটা ফুরোতে এখনো আট মাস বাকি। ও বলে আটটা ইন্টারভিউ গেল। এখনো বাকি ষোলটা ইন্টারভিউ। রাজ-বন্দীদের জন্য তৈরী করা সরকারি কানুন মোতাবেক প্রতি এক পক্ষে একটি করে ইন্টারভিউ পাবার অধিকারী আমরা। সেই পাক্ষিক ইন্টারভিউটাকে ভিত্তি করেই কারাগারের ক্যালেন্ডার তৈরি করে নিয়েছে খলিল।

আরো হিসেব আছে, শুনুন। গোটা বছরে দু'শো আটখানা চিঠি লিখবার 'হক' আমার। আমি লিখেছি দু'শো খানা। ক'খানা পেয়েছি জানেন?

জানবার আগ্রহ নিয়ে চেয়ে থাকলাম ওর মুখের দিকে। পেয়েছি সাকুল্যে চুয়ান্নখানা। এর মাঝে বৌর কাছ থেকে পেয়েছি মোটে পঁচিশখানা, তার মানে গড়পড়তা মাসে দু খানা।

শুধালাম লিখেছ ক'খানা?

দাঁড়ান খাতাটা দেখে নেই। বলে খাতাটা দেখল খলিল। দেখা সেরে বলল, তিপ্পান্নাখানা অর্থাৎ গড়ে হপ্তাপ্রতি একখানা। এখন বুঝে দেখুন মেয়ে জাতটা কেমন?

কিন্তু ওর আক্রোশটা তো আর সত্যি সত্যি মেয়েজাতটার বিরুদ্ধে নয়! ওর অভিমান– পত্র দে'য়ার ব্যাপারে কেন এতো কৃপণ তাহ্‌মিনা। তাই বলে চলল, আছি জেলখানায়, যাকে বলে হাত-পা মুখ চেপে ধরা। কোরবানীর গরু। শ্বাস নেয়াটাও যে এখানে নির্যাতন। এই সহজ সত্যটাও বোঝেনা ওরা। মেয়ের জাত এমনি নিষ্ঠুর।

বোঝেনা তাই বা ভাবছ কেন?

বোঝে না ছাই। খলিল এবার চটেই উঠল আমার উপর। বুঝতোই যদি তা হলে আমার তিপ্পান্নটা চিঠির জবাব আসে মোটে পঁচিশখানা? আর্ধেকেরও কম। আসল কথা কি জানেন হামেদভাই–?

বলার আগে যেন আমার অনুমতি চাইল খলিল। কবির উপর থেকে দৃষ্টি এবং মনোযোগটা ওর ঘুরে গেছে অন্যদিকে। এতেই আমি খুশি। তাই সোৎসাহে বললাম, বলে যাও, বলে যাও।

আসল কথা মেয়ে মাত্রই স্বার্থপর, বিশেষ করে এই আমাদের দেশে। শাড়ী চাই, বাড়ী চাই, গয়না চাই ওদের। ঐসব দিয়ে থুয়ে যদি রাজনীতি কর তুমি, জেলে আস, তাহলে অবশ্য আপত্তি নেই ওদের।

হো হো করে হেসে উঠলাম। ইচ্ছে হল বলি, এসবের ব্যবস্থাই যদি থাকবে তবে আর জেলখাটার রাজনীতি কেন, লোহা-লক্কড়ের কারবার করলেই হয়। কিন্তু সামলে নিলাম। বললাম, এটা কি নারীজাতির প্রতি সুবিচার হচ্ছে খলিল? এ রকম একটা ঢালাও অভিমত এমন হাল্কাভাবে প্রকাশ করা কি উচিত?

আলবৎ। স্বরটাকে আর এক পর্দা উচুঁতে তুলল খলিল। বেশী দূর যাবার দরকার কি? এই জেলখানার কথাটাই ধরুনছা কেন? এই যে ছেলে বুড়ো জোয়ান মিলে এতগুলো পুরুষ জেল খাটছি আমরা, কই একটি মেয়ে আছে জেলে?

নেই, তার কারণ নারীজাতি যাকে বলে ফেয়ার সেক্স, সরকার বাহাদুর ওদের প্রতি সদাশয়।

বাজে কথা। এবার ক্ষেপেই উঠল খলিল। এমনিতে তো চিঠি ভরা শুধু অভিযোগ, দেখা হলে ফ্যাচ ফ্যাচ কান্না, ছেলেটা কী খাবে, নিজে কী খাবে, কী পরবে, কোথায় থাকবে, নালিশের কি শেষ আছে? অথচ–।

অ-দা কৌতূহলী হয়ে কাছে এসে বসেছেন। সে জন্যই বুঝি ইতস্ততঃ করছে খলিল। বললাম হ্যাঁ, অথচ–?

গুণে দেখুন তো! আমি, রশিদ, আব্বাস, কুদ্দুস, ওয়াহেদুল, মান্নান, আলিম সবারই এক একটা জলজ্যান্ত বৌ। রাস্তায় জড়ো হলে রীতিমতন মিছিল হয়ে যাবে একটা। আমি বলি একত্রে মিলে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে আণ্ডা-বাচ্চা সব কোলে লয়ে জেলখানায় চলে আসেনা কেন ওরা? আর কিছু না হোক আহার বাসস্থান ফ্রি, বিনা খরচায় রীতিমতো সুরক্ষিত জীবন। তা নয় বাহিরে বসে বসে খালি আমাদের খোঁচাবে।

ঘূর্ণীর উপদ্রবটা থেমে গেছে। জানালা খুলে দিয়ে ফালতুরা চেয়ার টেবিলের ধুলো ঝাড়ছে।

ওরে আমার গুণধর! বিয়ে করেছ কি বৌর মাথাটাও কিনে নিয়েছ? এমন কি ঠেকা পড়ছে বৌর, তুমি হতভাগার জন্য জেল খাটবে? খোঁচা দেবার জন্যই কথাটা বললাম।

এইতো, এই জন্যই তো বনেনা আপনার সাথে। আচ্ছা হামেদভাই মেয়েদের প্রতি আপনার এমন একগুঁয়ে পক্ষপাতিত্ব কেন?

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা নতুন নয়। তাহ্‌মিনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তারপর নারীকুল, একান্ত বৈষয়িক নারীমনের হাজার স্বার্থপরতা এধরনের আলোচনাও এই প্রথম নয়। বিবেচনা করলাম এবার চুপ মেরে যাওয়াই বিধেয়।

কৌটিল্য বুদ্ধি নিয়ে এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন অ-দা। এবার মুখ খুললেন– তা সাজেশানটা তাহ্‌মিনাকে একবার দিয়ে দেখলেই তো পার। দেইনি ভাবছেন?

কি বলল তাহ্‌মিনা?

বলল? আমি সবে বলছি, আরো দুচারটা বৌ জুটিয়ে ছেলেপুলে কোলে নিয়ে একদিন যাওনা জেনারেল সাহেবের সদরে। ওরে বাবা, কথাটা কী শেষ করতে পারলাম? অমনি মুখিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

তারপর কি হল সে রিপোর্টটা শোনা গেল না। গ-দার বাঁজখাই গলা দুবাড়িই গরম করে তুলেছে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে উচু প্রাচীরঘেরা এ পৃথিবীর অভ্যন্তরেও সহস্র দেয়ালের ঘের। বড় দেয়ালের পর ছোট দেয়ালের বেড় দেয়া এমনি একটি চত্বর। মুখোমুখি দুটো লম্বাকৃতি দালান এক নম্বর এবং দু'নম্বর দালান। আপাততঃ এটাই আমাদের পৃথিবী। আমাদের কারো ঘর নেই, কারো বা থেকেও নেই। এই দালান দুটাকেই আমরা বলি ঘর। কখনো বা বলি বাড়ি। কারাকর্তৃপক্ষ বলেন সিকিউরিটি ওয়ার্ড অথবা ইয়ার্ড, মানে গারদ। তেমনি গোসলখানার পাশে যে চৌবাচ্চা, ওটাকে কারাকর্তৃপক্ষ বলেন চৌবাচ্চা, আমরা বলি 'যমুনা'। যমুনা নদীর তীরে বসে গল্প বলিয়ে এবং শুনিয়ের সংখ্যা নিত্যান্ত কম নয় এখানে।

সেই দু'নম্বর বাড়িতে তুমুল উত্তেজনা। উত্তেজনার কেন্দ্র আপাততঃ গ-দা। কিন্তু শুরু গ-দার পুষ্যি, ষ্ট্রেলকা ওরফে টেলকা আদরে টেলকুকে লয়ে। বাতাসের দাপটে জানালাগুলো যখন খটাখট ঝনাঝন বাড়ি খেয়ে মরছিল তারই আওয়াজে ভয় পেয়েছিল টেলকা। ভয়ে দিশেমিশে না পেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল মান্নানের বিছানায় বালিশের আড়ালে। বাতাসটা কমে আসার পর মান্নান হঠাৎ আবিষ্কার করল, তাকিয়া হেলান দিয়ে একান্ত নির্বিবাদি দুটো চোখ মেলে ওকেই দেখেছে টেলকা। আর যায় কোথায়। মিয়া সাহেবের লাঠিটা চেয়ে নিয়ে বেচারির পিঠে বসিয়ে দিয়েছে কয়েক ঘা কিন্তু গ-দার ভক্তের অভাব নেই দু'নম্বরেও। রশিদ তক্ষুনি প্রতিবাদ করে উঠেছে। ব্যাস, গোটা বাড়িটাই ভাগ হয়ে গেছে দু'দলে।

গ-দা চটেছেন। একটা অবুঝ প্রাণী, তাকে কেন অমন করে মারবে মান্নান?

মান্নানের বক্তব্য, বিড়াল পুষলে দরকারী আদব কায়দাগুলোও শিখিয়ে দিতে হবে। শেখান হয়নি, নইলে অন্যের বিছানায় গিয়ে ওঠে কেন? আর এ রকম বিছানায় উঠলে একশোবার মার খাবে টেলকা।

গ-দার কথা, বাড়িতে ছেলেপুলে থাকলে কি এক আধটু দুষ্টুমি করে না? যখন তখন বিছানায় উঠে চাদরটা কি একটু আধটু নষ্ট করেন?

এ কথা শুনে বিড়াল বিরোধীরা অর্থাৎ মান্নানের দল প্রথমে উলুধ্বনি করে তারপর ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে। হাসি থামলে মান্নান বলে, একেই বলে বুড়ো বয়সের ভীমরতি। কোথায় ছেলেপুলে আর কোথায় বিড়াল? হা কপাল!

চটে গিয়ে তোতলাতে থাকেন গ-দা। আর এই ফাঁকে বুঝি গ-দারই কোন সমর্থক ঠন ঠন থালা পিটিয়ে বাজিয়ে দিল খেলার ঘন্টা। আপাততঃ মুলতুবী থেকে যায় বিড়াল-পর্বটা।

অ-দার চেয়ে বছর দুই বড় গ-দা। অ-দার ঠিক বিপরীত গ-দা। গ-দা কারো পিছনে লাগতে যায় না কখনো। কিন্তু ছেলে ছোকরার দল সারাক্ষণ

লেগেই আছে গ-দার পেছনে।

মন খারাপ করে গম্ভীর হয়ে যান গ-দা। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন আঙ্গিনার এক পাশে। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায়না। কেননা গম্ভীর হলেই চচ্চড় করে চড়ে যায় গ-দার ব্লাড প্রেসার।

খেলতে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে মান্নান ফস করে উপুড় হয়েই ধরে ফেলল গ-দার পাজোড়া। বলল, গ-দা! মাফ করে দিন। এমন কসুর হবেনা কখনো।

বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি পাটা সরিয়ে নেন গ-দা। বলেন দেখ, দেখ কাণ্ড পাগলটার।

নাছোড়বান্দা মান্নান। আবারও উপুড় হয়ে পড়ে গ-দার পায়ের ওপর, বলে, ছাড়ছিনেকো। বলুন মাফ করেছেন।

আচ্ছা যা, মাফ করেছি। হল তো? কী যে পাগল তোরা। বলতে বলতে হাসেন গ-দা।

বিকেল এল। বিকেল চলে গেল। অচলায়তনের ওপারে কেমন করে অস্ত যায় সূর্য? জানিনা। সূর্যের সাথে দেখা নেই অনেক দিন। অনেকদিন দেখা হয়নি অব্যক্তরাগ পশ্চিম আকাশ। পশ্চিম বলয় লুপ্ত গরাদের এপারে। তাই সায়ংকালের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র রং আর রূপের মায়া ছড়িয়ে সন্ধ্যা নামেনা এখানে। সন্ধ্যা নামে রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মতন, অতর্কিতে।

সন্ধ্যা নেমেছে।

সন্ধ্যার কালো প্রাঙ্গনে আজ খস খস দৌড়ে বেড়ায় কয়েকটি শুকনো পাতা। হঠাৎ শুনলে মনে হয় কারা যেন নগ্ন পা ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে চলাফেরা করছে ওখানে। বিপত্র শিউলী গাছটা যেন খোয়ানো এক শোকার্ত রমণী। নীরস চৈতি পৃথিবী ওর সব রস টেনে নিয়েছে। মেঘহীন খটখটে আকাশের দিকে উঁচিয়ে থাকা শুকনো কাঠির মতন ওর অপত্র শাখা, যেন অজস্র কণ্ঠ-ফরিয়াদ– বৃষ্টি চাই, জীবন চাই। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! কোথায় জীবন!

গুটিকয় শুকনো পাতা তবু শিউলী ডালের মায়া কাটাতে পারেনি। প্রাণপনে আঁকড়ে রয়েছে নিজের যায়গাটুকু, কিছুতেই আশ্রয়চ্যুত হবেনা ওরা।

কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাতাস এল, যেমন করে আসে চৈত্তির মাসে। সব-খোয়ানো সেই শোকার্ত রমণী বুঝি বার বার মাথা কুটে মরল, হাহাকার তুলল। গুটিকয় অবশিষ্ট পাতা, বছরের শেষ রাতে ওরাও ঝরে পড়ল।

আমার আয়ু থেকে খসে পড়ল আর একটি বছর।

বৈশাখী পূর্ণিমা

লৌহকপাটের সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে পূর্ণিমা রাত বুঝি গভীর সোহাগে টেনে নিয়েছে এই কারাকুঠিটাকে। চাঁদের সুধাভরা একফালি রাত গরাদের শিক ভেঙ্গে লটিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। কিছু তার আমারই শয্যার প্রান্ত ছুঁয়ে। গরাদের শিকে পা রেখে বসে আছি বিছানায়।

বিজলী তারে কি যেন গড়বড়। ঘরে আজ আলো নেই। শুধু পুব কোণে কবির টেবিলে হ্যারিকেন। নাতিউচ্চ শিখায় হাতখানিক যায়গা একটু ফর্সা করে রেখেছে মাত্র।

মন্টু শুয়ে আছে, মাথা ধরেছে। হাসিব আর খলিল সনুমামার টেবিলে গিয়ে আড্ডা জুড়েছে। ফকিরভাই ফালতুকে দিয়ে গা টেপাচ্ছেন। বাদ-বাকী সবাই আগেভাগেই আজ লম্বা হয়েছেন।

কালাম এল। চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম, বসো। ও চেয়ারটাকে আগিয়ে বসল গরাদের ঠেসে মুখ রেখে। বলল, ভালোই হয়েছে আলো বুজে, নইলে এমন সুন্দর পূর্ণিমা রাতটা বৃথাই যেত।

লক-আপের পর ঘুমানো পর্যন্ত এই রাত্রির বেলাটুকুই কালামের যা অবসর। দিনভর যতোজনের যতো রকমের ঝামেলা ওকেই পোহাতে হয়।

কালাম আমাদের প্রতিনিধি। ধোবি মেথর ঝাড়ু ফিনাইল থেকে শুরু করে কাপড়চোপড় খানাপিনা পর্যন্ত সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা লেনদেনের মালিক আমাদের প্রতিনিধি। সকলে মিলে নিজের নিজের কথা বলা নিজের নিজের জিনিষ চাওয়া, এর মাঝে শুধু হৈ হট্টোগোল বিশৃঙ্খলা নয়, শোভন রুচি আর শালীন আচরণের অভাবটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে বুঝি। অন্য কারণ বাদ দিয়েও হয়তো এই একটি কারণেই ডেটো না হয় এই প্রতিনিধি ব্যবস্থাটা চালু হয়েছে সেই ইংরেজ আমল থেকে। কালাম উঠেই লম্বা একটা ফর্দ নিয়ে বসে পড়ে বর্ষ-শুরু সন্দেশ খেয়ে। বড় বাড়ি থেকে সন্দেশ পাঠিয়েছে।

এ প্রাচীর-দুনিয়ায় এক নম্বর দু'নম্বর ছাড়াও বাড়ি আছে, ঘর আছে। যেমন আছে অন্ধ কুঠুরি, জেল পরিভাষায় যার নাম সেল। এ সব পৃথক পৃথক নিবাসে বিক্ষিপ্ত করে রাখা আমাদের আত্মার আত্মীয়। বাইরের পৃথিবীতে দিনভর যাদের একত্র ওঠা-বসা এই প্রকার-জগতে এসেই তারা আলাদা। সারা বছরে দেখা হয়

মোটে দু'বার,– দুটো ঈদের দিনে, ঈদের মাঠে। তাও দূর থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে সামান্য হস্ত উত্তোলন। একটু বা হাসিভরা মুখের নীরব সম্ভাষণ। কাছে আসা, বুকে বুক মেলান অথবা কথা বলা– এসব নিষিদ্ধ।

বড় বাড়ি শুধু আয়তনেই বড় নয়। সেখানে রাজবন্দীদের বৃহৎ অংশের প্রবাস। তাছাড়া বড় বাড়িতে আমাদের হেঁসেল। ওরা চিন্তা ভাবনা করে মেনু বানায়। খেটে-খুটে রান্না করে। জিনিষপত্রের জন্য ঝগড়া করে জেল দারোগাদের সাথে। আমরা নিশ্চিন্ত মনে সে অন্ন গলাধঃকরণ করি আর পান থেকে চুণটুকু খসলেই নিদাঘতপ্ত আবহাওয়াটাকে আরো উত্তপ্ত করে তুলি।

সন্দেশের সাথে ছোট্ট এক বাটি পুডিংও এসেছে। এটা রশিদের স্পেশাল। পাঠিয়েছে ওর বড় ভাই খালেদ। খালেদ থাকে বড় বাড়িতে। আপাততঃ হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলছে। কিন্তু পুডিংটা একলা কিছুতেই খাবেনা রশিদ। অনেক চাপাচাপি বলাবলিতেও রাজি হল না সে। তার কথা– বারে, আমি একলা খাব কেন?

বেশ, যে তিনজনকে মনে কর তোমার একান্ত অন্তরঙ্গ তাদের নিয়ে ভাগ করে খাও। একটা আপোষের ফর্মুলা দিল কালাম।

বাঃ, শুধু তিনজন কেন, সবাই আমার অন্তরঙ্গ। আপোষ প্রস্তাবটাও মেনে নিলনা রশিদ। শেষ পর্যন্ত ওর ইচ্ছাটাই বহাল থাকল। চায়ের চামচের এক চামচ করে সবাইকে খাইয়ে যখন শেষ ভাগটা আমাকে দিতে এল রশিদ তখন দেখলাম পুডিংয়ের এতটুকু অবশিষ্টও নেই বাটিতে। সেই বাটিটাই তৃপ্তির সাথে চেটেচুটে খেল রশিদ।

শোবার উদ্যোগ করছি। তেসরা পাহারার তালা খটখটানিতেই বুঝি ঘুম ভেঙ্গ গেছে মন্টুর। অথবা আদৌ ঘুমায়নি ও, জেগেই ছিল। মশারির ভেতর থেকেই শুধাল, আচ্ছা হামেদ ভাই আর একটা বছর কেটে গেল তাই না?

যা স্বতঃসিদ্ধ তেমনি সব ব্যাপার নিয়ে আচমকা প্রশ্ন করে বসে মন্টু। এ দোষটা ওর কিছুতেই শোধরানো গেলনা। মুচকি হেসে বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে।

আমার তো মনে হয় বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল বছরটা। টেরই পেলাম না, বলল মন্টু।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, এমন সময় ধরে এনেছে মন্টুকে। জেলে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে ও। আই, এ-টাও এখান থেকেই পাশ করেছে। এখন বি, এ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। বিকেলে ভলি, দুপুরে তাস, বাদ-বাকী সময় বই মুখস্থ করে দিন কেটে যায় মন্টুর। পড়াশোনায় অখণ্ড মনোযোগ ওর। হয়ত তাই

কারাগারের নিশ্ছিদ্র অবকাশে সময়টা যে চেপে থাকে পাথরের মতন, নড়তে চায়না সহজে, এই অভিজ্ঞতাটা এখনো পেতে হয়নি ওকে।

কিছু বলছেন না যে?

অ-হু-মানে এ বছরটা ছমাসে গেল কিনা? তাই টের পাওনি।

মশারির ভেতর থেকে মুখটা তড়াক করে বের করে আনল মন্টু। শুধাল, ঠাট্টা করছেন?

এ আর এক মুশকিল মন্টুকে নিয়ে। ঠাট্টা হিউমার তেমন বোঝে না ও। আমাকে নীরব দেখে মুখটাকে বেশ গম্ভীর করে বলল ও। আচ্ছা, হামেদ ভাই? আপনার যে ছোট ভাই, তারও যে ছোট জন তিনি হলেন গিয়ে আমার দুবছরের সিনিয়র। তার উপর আপনি আমার মাষ্টার। আপনার কি এসব ঠাট্টা সাজে?

আরে না না ঠাট্টা কোথায়। বলছিলাম হৃদয়ে তোমার প্রাচুর্যের ঢল। জেলটা তাই জেলই মনে হয় না তোমার কাছে। ফুস করে কেটে গেছে রুদ্ধ কপাটের বছর। টেরই পাওনি। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

আমার কথায় শুধু আশ্বস্ত হলনা মন্টু, কৃতার্থ খুশিতে কথার টাট্টু ছোটাল। ঠিক ঠিক আমিও তো তাই বলছিলাম। জেল খাটাটা যেন গায়েই লাগলনা। কেমন তর তর করে কেটে গেল বছরগুলো। আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, এইতো মোটে সেদিন এলাম জেলে। এই তো সেদিন লোহার ফাটকটা পেরিয়ে প্রবেশ করলাম অচেনা দুর্গে। অজানা ভয়ে দুরু দুরু বুক। না জানি কোথায় কেমন করে কার সাথে রাখবে ওরা। নাকি ছুঁড়ে দেবে কোন্ অন্ধ কুঠুরিতে। ফেলে রাখবে তালা মেরে। সম্ভব অসম্ভব কত কি-ই-না ভেবেছি সেদিন। এর আগে তো কখনো আসিনি জেলে। সত্যি কথা বলতে কি হামেদ ভাই, শরীরটা আমার কাঁপছিল ভয়ে। ঠক্ ঠক্ করছিল পা জোড়া। মনে হচ্ছিল হাঁটু ভেঙ্গে এক্ষুনি বুঝি একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করে ফেলব। কোন রকমে জমাদারের পিছু পিছু হেঁটে চলছিলাম। তারপর এই দরজার এপারে আমাকে জমা দিয়েই চলে গেল জমাদার। চেয়ে দেখি আপনি আর অ-দা মুচকি মুচকি হাসছেন। আপনারা আগেই জেনে গিয়েছেন আমি আসছি। অ-দা আমার হাতে এক গেলাস সরবত তুলে দিয়ে বললেন, ভায়া! এসেছো যখন থাকো কিছুকাল।

আমি শুনছি কিনা সে সম্পর্কে একটু থেমে যেন নিশ্চিন্ত হতে চাইল মন্টু। তারপর শেষ করল, এ সব তো কবেকার ঘটনা। কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিন।

সে যে কবে, তবু মনে হয় এই তো সেদিন! হাসতে হাসতে ওর কথাটাই পুনরাবৃত্তি করলাম। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলাম মশারির তলায়।

পয়লা বৈশাখ

খলিল বলল, আর একটি বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল জীবন ভাণ্ডে।

কবি বলল কবিত্ব করে, জীর্ণ পাতার বেশ ছেড়ে জীবন এগুলো আর এক ধাপ কিশলয়-সার্থকতার পানে।

অ-দা বললেন, আর কি, এখন কবর ডাকছে!

রশিদ আমাদের মাঝে বয়োকনিষ্ঠ। সে জন্য কত খেদ ওর। ও বলল, জানেন হামেদ ভাই। এক বছরে ওজনে বাড়লাম পনের পাউণ্ড আর মাথায় এক ইঞ্চি থেকে সামান্য বেশি। জেলখানাতেই দেখছি রীতিমতন জোয়ান হয়ে উঠলাম।

আর আমি বলেছি, আয়ু থেকে খসে পড়েছে আরো একটি বছর!

অতিক্রান্ত বছরটিকে নিয়ে বক্তব্যের এই তারতম্য। একি শুধু অভিজ্ঞতা আর বয়স-ভেদের প্রকাশ? অথবা অন্য কোন বিশিষ্টতার অভিব্যক্তি?

কবির উদ্যোগেই ছোট্ট একটি জলসা বসল বিকেলের দিকে। বর্ষবরণ উৎসব। রশিদ এবং মান্নান গান ধরল। প্রবন্ধ পড়ল সাংবাদিক।

কবি আবৃত্তি করল 'নবজাতক' থেকে–

"নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
'নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা।"

মন্ত্রী ছিলেন অথবা মন্ত্রীদের সাথে ওঠা বসা করেছিলেন এমনি পাঁচ সাতজন হোমরা চোমরা এই জেলের বড় বাড়ি এবং অন্যান্য যায়গায় ছিটিয়ে রয়েছেন।

তারাও হয় সরকারী নতুবা আপন খরচায় বিজলী পাখা পেয়েছেন। ফকির ভাইর সীট ঘরের আর এক পাশে। কিন্তু এখান থেকেও শোনা যায় শোঁ শোঁ পাখা ঘোরার শব্দ। হাসিবের দিকে তাকিয়ে বললাম আবার, পড়তে তো পারছ ছাই। যাওনা কেন পাখার নীচে।

এবার নড়ে চড়ে ঋজু হয়ে বসল হাসিব। আমার চোখে চোখ রেখে বলল আপনি ভাবছেন বিজলী পাখার হাওয়া খাবার জন্য মরে যাচ্ছি আমি?

ঠিক উল্টোটাই ভাবছি। ভাবছি ফকিরভাই কত দিন তোমাকে ডাকল খাটটা নিয়ে চলে এস আমার পাশে। কিন্তু তুমি যাওনা কেন? যাই না লজ্জায়।

লজ্জায়!

লজ্জা নয়? আপনারা এতগুলো মানুষ গরমে আইঢাঁই করবেন, আর আমি দিব্যি বিজলী পাখার হাওয়া খাব। নির্লজ না হলে এটা কেউ পারে?

আমাদের কথা বাদ দাও। বাহিরে থাকলে হয়ত এ রোদেই ফাটা মাঠে পা চিরে চিরে হাটতে হত। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। বাড়ীতেও তুমি ইলেকট্রিক ফ্যানে অভ্যস্ত।

তাই বলে কি ছাড়তে হবেনা? অভ্যাসটা অমন কত অভ্যস্ত আরাম কতজনকেই তো হারাম করতে হয়েছে। হঠ্যাৎ তেতে উঠল হাসিব।

এই উত্তাপ যতটা না আমার বিরুদ্ধে তার চেয়ে বেশী ফকির ভাইর বিরুদ্ধে। এমনিতেই ফকির ভাই সম্পর্কে ওর বিক্ষোভ। ও বলে এসব লোক রাজনীতি করে শুধু মন্ত্রীত্বের অভিলাষে। দু'চার ছ'মাস জেলও খেটে যায়। তার উপর যেদিন ফকিরভাইর দরখাস্তের জবাবে বিজলী পাখার অনুমতি এল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাখাটা ফিট করে গেল মিস্ত্রী, সেদিন থেকেই গজ গজ করে চলেছে হাসিব, থাকবে তো বড় জোর ছয় মাস। তারপর হয় বণ্ড দিয়ে নয়তো তদ্বির করে চলে যাবে। এ কয়টা দিন পাখাটা না হলেই চলত না?

আমি বলি, এটা তাঁর প্রয়োজন, সরকারও তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এতে তোমার আপত্তি কেন?

আলবত আপত্তি করব। কই বক্তৃতার বেলায় তো কেউ কম যাইনা। ঢক্কা-নিনাদে ঘোষণা দেই, দেশহিতে সর্বস্ব ছেড়েছি, কত জেল জুলুম সয়েছি। কিন্তু এই তার নমুনা? এতগুলো রাজবন্দী গরমে সেদ্ধ হয়ে চলছে আর আমি কিনা শুয়ে শুয়ে পাখার হাওয়া খাচ্ছি।

অপরাধী যেন আমিই। ধিক্কার যেন আমারই প্রাপ্য। তেমনি চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল হাসিব।

অ-দার কৌতুহলী কান দুটো যেন চব্বিশ ঘন্টাই জেগে থাকে। যেখানে আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক অথবা একটু মজলিস সেখানেই হাজির অ-দা। আজও কৌতুহলী কান দুটো নিয়ে কখন চুপিসারে এসে বসেছেন মন্টুর পেছনে, কেউ লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্য করলাম যখন মুখ খুললেন অ-দা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন অ-দা, ফকির সাহেব হলেন গিয়ে নেতা। নেতারা বরাবরই কিছু প্রিভিলেজ পেয়ে থাকেন।

ধুত্তরি নে-তা, অমন নেতা–। জিবের ডগায় বুঝি এসে পড়েছিল অশ্রাব্য কোন খিস্তি, সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল হাসিব।

আমি বললাম, হাসিব, এসব ব্যাপারে মনটাকে একটু উদার রাখা উচিত।

উ-দা-র। আমার কথাটারই ব্যাঙ্গাত্মক উচ্চারণে মুখখানা বিকৃত করল হাসিব। বলল, এ জাতীয় স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক লোকগুলো কেন যে রাজনীতি করতে আসে আমি বুঝিনা। দেশপ্রেম একটি মহৎ প্রবৃত্তি। আত্ম-চিন্তা, স্বার্থপরতা এ প্রবৃত্তির সাথে খাপ খায় কখনো? আসলে ওই লোকগুলো বাজে–ফলস। সেলফিস। খাঁটি নয় ওদের দেশপ্রেম।

এই শুনতে পাবেন ফকির সাহেব। অ-দা তাড়াতাড়ি নিজের ঠোঁট আঙ্গুল চাপিয়ে সাবধান করে দিলেন হাসিবকে।

হাসিব কিন্তু নির্বিকার। যাকে বলা হয় চোখের হায়া মুখের 'আব্রু, সে সব বালাই নেই ওর। একদিন ফকিরভাইর মুখের উপরই বলে দিয়েছে, ফকিরভাই, ইন্টারভিউতে এতো খাবার আসে আপনার, কই আমাদের খাওয়ান না তো?

কাঁচুমাচু খান ফকির ভাই। কাঁচমাচু খেয়ে হাতের কাছের কুমড়ার মোরব্বার বয়ামটাই এগিয়ে দেন ওর দিকে, খাও।

উঁহু আমি একলা খাব কেন? মুখে বললেও অবিচলিত চিত্তে মোরব্বার বয়ামটা হাতে তুলে নিয়েছিল হাসিব। অ-দা, গ-দা এমনি বয়োজ্যেষ্ঠদের গিলাতে না পেরে অবশেষে রশিদ আর খলিল এই দু'বন্ধুকে নিয়ে কয়েক মিনিটেই বয়ামটা সাবাড় করেছিল। তারপর ধুয়ে মুছে খালি বয়ামটা রেখে গেছিল ফকির ভাইর টেবিলে।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। এক আর দুনম্বর বাড়ি মিলিয়ে এখানে যে পঁচিশজন রাজবন্দীর নিবাস তাদের মাঝে আত্মীয় স্বজন থেকে নিয়মিত টাকা আনতে পারে এমন বন্ধুর সংখ্যা জন তিন কি চারের বেশী নয়। ধূমপায়ীর সংখ্যা সে তুলনায় অনেক বেশী। তবু ওই তিন চার জনের উপর নির্ভর করে মোটামুটি চলে যায়। কিন্তু এর মাঝে এক মাস টাকা এলনা মান্নানের। খলিলের টাকা আসতেও দেরি হচ্ছে। ওর বৌ চলে গেছে খুলনা। কখন টাকা পাঠাবে ঠিক নেই। ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তাকে এখানে বলা যায় সংকট। কেননা এমনও দুচার জন রয়েছেন যারা সর্বস্ব ত্যাগ করেও একটুখানি লোভ বাঁচিয়ে রেখেছেন জীবনে। সে লোভটা হল ধূমায়িত এক পেয়ালা চা আর জ্বলন্ত একটা বিড়ি। চা সরবরাহ করেন সরকার। অতএব নিশ্চিন্ত। কিন্তু বিড়ি সিগারেটের দায়িত্ব সরকারের নয়। সুতরাং আমেরিকার ট্রেডসাইক্লের মতন বিড়ি সংকট মাঝে মাঝেই উপস্থিত হয়।

সংকটে পড়ে ঘুম নেই হাসিবের। বিড়ি, সিগারেট, নস্যি, তামাকের যে 'কমনফাণ্ড তার সর্বময় পরিচালক হাসিব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের বাড়ির উপর অনেক সময় অন্যায় আবদার করেছেও, যা সম্ভব নয় তার চেয়েও বেশী টাকা এনেছে বাড়ী থেকে। কিন্তু সমস্যাটা তো আর দু-চার ছ'মাসের নয় যে বাড়ি থেকে দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা দিয়ে ঠেকার কাজ চালিয়ে নিল? সমস্যাটা ক্রনিক। বছরের পর বছর মাসিক বরাদ্দের উপরও টাকা যুগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই বাড়ির।

সংকট এলেই মিটিং বসে। এবার ও 'কমন ফাণ্ডের' ডোনারদের সভা ডাকল হাসিব। খলিল প্রস্তাব দিল, কোটা কমিয়ে দাও।

ইতিমধ্যে বিড়ির কোটা দৈনিক আটটা থেকে প্রথমে সাতটায় তারপর ছয়টায় নেমেছে। তাই রাগতঃ স্বরেই বলল হাসিব, অসম্ভব। ছটার নীচে কোটা কিছুতেই নামানো যায় না।

তা যদি না যায় তবে রশিদের সিগারেটটা বন্ধ করে দাও। সিগারেট ওর বাড়ি থেকে নিয়মিতই আসছে। তা দিয়েই চলুক এ মাস। আর একটা প্রস্তাব দিল খলিল।

এটা রশিদের বড় দুর্বল যায়গা। ও বিড়ি খায়না। খায় সিগারেট এবং একটু বেশী মাত্রায়ই খায়। খলিল মওকা বে-মওকা ওর এই দুর্বল স্থানটিতেই বার বার

আঘাত দেয়। ক্ষুন্ন চোখে রশিদ একবার তাকাল সবার মুখের দিকে। ততোধিক ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলল, সবার অসুবিধে করে আমি একলা সুবিধে ভোগ করব, এতো আর হতে পারে না। হোক আমার কোটা ক্যানসেল।

বুঝি রশিদের ক্ষুন্ন স্বরেই কালামের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ করেই বলল ও, দাও তো বেচারাকে দৈনিক মোটে চারটি করে ক্যাঁচি সেটা আর কাটছ কেন?

দৈনিক চারটে কি কম মনে হল আপনার কাছে? মুখটাকে লম্বা আর সুঁচালো করে শুধাল খলিল। দৈনিক চারটে মানে মাসে একশো কড়িটা। বছরে এক হাজার চারশো চল্লিশটা অর্থাৎ একশো ছিয়াল্লিশ প্যাকেট। দাম একচল্লিশ টাকার উপর। এখন এটাকে গুণ করুন চার বছর বা পাঁচবছর দিয়ে অর্থাৎ যতো বছর থাকতে হবে। তাহলে কতো টাকা হবে? কেউ কি বাইরে টাকার গাছ পুঁতে জেলে এসেছে?

ওরে বাবা তুমি তো দেখছি সংখ্যা-রাজা মুরাদকেও ছাড়িয়ে গেলে। ঠাট্টা করে বললাম আমি। কিন্তু আমার ঠাট্টায় চাঙ্গ হল না কেউ। না খলিল, না রশিদ।

আচ্ছা, সমস্যাটা কি সাময়িক! একটা রেসেশান মানে মন্দা? নাকি সত্যিকারের ক্রাইসিস? হঠাৎ শুধাল কালাম। কলেজ জীবনে অর্থনীতির ছাত্র ছিল কালাম। এখনও অর্থনীতির বই পেলে নাড়াচাড়া করে। তাই ওর প্রশ্নেও সেই ধাত।

একেবারে জেনারেল ক্রাইসিস, বলল খলিল।

এক কাজ কর। কোটা ফোটা না কেটে এ মাসে যা ঘাটতি পড়ে, আমার পি, সি, থেকে কেটে নাও। তারপর, দেখা যাবে সামনের মাসে।

কালামের প্রস্তাবটা মেনেই নিচ্ছিলাম। কিন্তু আপত্তি তুলল খলিল। সে হতেই পারে না, এমনিতে মাসে চার টাকা ডোনেট করার কথা আপনার। সে জায়গায় ছয় টাকা কোন মাসে আট টাকাও দিচ্ছেন।

প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কালাম। কিন্তু হাসিব তখন উঠে পড়েছে। আমাদের বসতে বলে ও চলে গেল সোজা ফকির ভাইর কাছে। বলল ফকির ভাইকে, আমরা ঠিক করেছি আপনাকে 'কমন-ফাণ্ড-এ' প্রতি মাসে চার টাকা কনট্রিবিউট করতে হবে।

বেশ তো। ফকির ভাই এক কথাতেই রাজি।

ফকির ভাইকে ছেড়ে হাসিব গেল সনু মামার কাছে। সনু মামা বরাবর পাঁচ টাকা করে দিয়ে আসছেন। ইচ্ছে করলে হয়তো আরো বেশী করে দিতে পারেন। দেয়া উচিত। এ কথাটাই বলল হাসিব। সনু মামার মাসিক দেয় পাঁচ টাকা থেকে সাত টাকায় তুলে ফিরে এল হাসিব। বলল, সভা এখানে শেষ।

আমরা যারা বিড়ি কমিটির সভ্য এবং যারা ধূমপায়ী সবাই একযোগে সেদিন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।

প্রায় নিতম্ব অবধি লুংগিটাকে গুঠিয়ে এনে শুয়ে রয়েছেন ফকির ভাই, শোঁ শোঁ পাখাটা ঘুরছে মাথার উপর। আবারও ওই পাখাটার দিকেই চোখ রেখে গজ গজ করে চলেছে হাসিব।

একটু বা মেঘের ছায়া আকাশে। আর কয়েক ঝলক বাতাস। এতেই কিঞ্চিৎ নেমে গেছে গরমের মাত্রা। পিঠের ভিজে তোয়ালেটা তারের উপর টেনে দিয়ে এল হাসিব। বলল, শুনুন হামেদ ভাই, এসব বাজে মাল দিয়ে নেতৃত্ব আর চলবেনা। সৎ কর্মঠ ত্যাগী উদারমনা নেতৃত্ব চাই আমাদের। ওই যে আর একটা চেলা আছে তার— মকবুল, ওটাকে দেখেছেন? সবার খাওয়ারটা একলাই খেয়ে ফেলতে চায়। সারাক্ষণ শুধু খাই খাই। যেন খাওয়ার জন্যই জেলে এসেছে। একটু থামল হাসিব। বলল আবার, এসব লোক করবে দেশ সেবা? ফুঃ।

হাসিবের বক্তব্যটা এতোই সত্য যে এর উপর কথা চলে না। এর আগেও এ প্রসঙ্গ নিয়েই কতদিন আলোচনা উঠেছে। হাসিব কিছুতেই মানতে রাজি নয়, সত্য মিথ্যা ভালমন্দ মিলিয়ে যে মানুষ তাদের সাথে তাদের নিয়েই চলতে হবে জীবনের পুরো পথ। আমার যে ভালো সে ভালোর গুণেই ধীরে ধীরে অপসারিত হবে অপরের যতো সব মন্দ। এসব নীতি কথা দাগ কাটেনা ওর মনে।

তবু অ-দা বললেন, তুমি তো একটা আদর্শ অবস্থা কল্পনা করে নিয়েছ মনের ভেতর আর সেখানেই বাস করে চলেছো। মুশকিল হয়েছে তোমার সেই আদর্শ আর বাস্তবের মাঝে ব্যবধানটা বড় বেশী।

অর্থটা খোলাসা করবেন? তীক্ষ্ণ হয়েই শুধাল হাসিব।

বিতর্কে যখন উত্তেজিত হয় হাসিব ওর গৌর মুখটা তখন কুষ্কমারী মেয়ের মুখের মতোই ক্ষণে ক্ষণে রাঙ্গা হয়ে উঠে। ওর রাঙ্গা মুখটার দিকে তাকিয়ে

বললাম, অ-দার কথা হল, একলা চলা নয় সবাইকে নিয়ে চলা-এ নীতিটাই সঠিক।

তর্কে একগুঁয়ে হাসিব। একগুয়ে স্বরেই বলল, ওই নীতির দোহাই পেড়ে অনেক বাজেমাল গছিয়েছেন। আর নয়। একলা চলতে হয় তাই চলব।

তারপর চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল হাসিব যার অর্থ এখানেই সমাপ্তি।

বই বন্ধ করে শুনছিল মন্টু। একটি কথাও বলেনি এতক্ষণ। আমরা উঠি উঠি করছি। এমন সময় কী যেন মনে পড়ে গেল ওর। শুধাল, আচ্ছা হামেদ ভাই, সরকার চালায় যে লোকগুলো ওদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই? এতগুলো রাজবন্দী, একসাথে থাকি আমরা। ইলেকট্রিক ফ্যান দিবি? সবাইকে দে, তা নয় বেছে বেছে ওই একজনকে কেন? এ আবার একটা প্রশ্ন? হো হো করে হেসে দিলাম আমরা। হাসিবও।

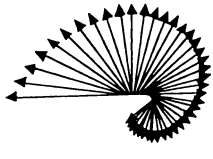

আটই বৈশাখ

নিদাঘ দুপর। রোদ তো নয় যেন গলা আগুন। ছাদ আর চারিপাশের দেয়াল চুঁইয়ে চুঁইয়ে বুঝি আগুনের স্রোত নামছে। ঘরের মানুষগুলো সেই টগবগে আগুনে বলক খেয়ে খেয়ে সেদ্ধ হয়ে চলেছে।

ঠাঁ ঠাঁ রৌদ্রে সিমেন্ট-করা উঠোনটা আগুনের মতো তেতে উঠছে। কিন্তু কী করবে! সেলিম ভাই রোদেই পায়চারি করছেন।

এই পাগলটা আজ নির্ঘাত 'সানস্ট্রোক' হয়ে মারা যাবে। কালাম যাও তো একটু সেলিমকে ঘরে নিয়ে এস। আমি কত করে ডাকলাম তা আমার কথা কি শোনে? বলতে বলতে কালামের সীটের দিকে উঠে গেলেন গ-দা।

শুতে পারিনা। ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর। তাল পাখাটা ঘোরাতে ঘোরাতে ফোস্কা পড়েছে হাতে। সুমুখে বই খুলে কেবলই হাঁসফাঁস করছে মন্টু আর হাসিব। হাসিবও পরীক্ষার্থী। একখানা ভিজে তোয়ালে পিঠের উপর বিছিয়ে রেখেছে হাসিব। মাঝে মাঝে তোয়ালেটা চিপিয়ে অতিরিক্ত ঘামটা ঝরিয়ে আসছে সিড়ির লাগ ড্রেইনে। রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুছছে ঘামে ভিজে যাওয়া চশমার কাঁচ। আর মাঝে মাঝে কি এক সতৃষ্ণ চোখ তুলে দেখছে অদূরে ফকিরভাইর মাথার উপর ঘুর্ণীয়মান বিজলী পাখাটা।

বললাম– হাসিব, চেয়ারটা নিয়ে যাওনা ফকিরভাইর পাখার নীচে। এত গরম তো সহ্য হচ্ছেনা তোমার। পড়ারও ব্যাঘাত ঘটছে।

যেন ওর গোপন কোন দুর্বলতা একান্ত অসাবধানে ধরা পড়ে গেছে আমার সুমুখে। তাই লজ্জিত চোখজোড়া বিজলী পাখার দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে পুস্তকের পৃষ্ঠায় লুকিয়ে ফেলল হাসিব।

ফকিরভাই ভাগ্যবান। জয়যুক্ত গণআন্দোলনের মাথায় চড়ে একদা মন্ত্রীত্বের আসন পেয়েছিলেন তিনি। তারই জোরে এই কারাগারেও সরকারী খরচায় একখানা বিজলী পাখা জুটেছে তার কপালে। এ রকম কালাম। সঙ্গে থাকে একগাদা চিরকুট লেখার কাগজ। বেশীর ভাগই খালি, সিগারেটের বাক্স, ডাক্তারি পুরিয়ায় কাগজ, একখানা বা দুখানা স্লেট। এই স্লিপ স্লেটের কোনটা যায় অফিসে

জেলার ডিপুটি জেলারের কাছে কোনটা হাসপাতালে, কোনটা বড় বাড়িতে রান্না ঘরে, কোনটা সুবেদার বা জমাদারের কাছে নিত্যদিনের খুঁটিনাটি তাম্বিতাগাদা নিয়ে। এরপর হয়ত আসবে গাটরি ভাত লুঙ্গি চাদর সার্ট পাজামা। জমাদারের কাছ থেকে সেসব বুঝে নিয়ে নাম মিলিয়ে মিলিয়ে সবাইকে বিলি করে দেয়া। ওকাজটা করতে করতেই হয়ত এসে গেল চিঠি দরখাস্তের কাগজ পত্র-পত্রিকা বই পুস্তক। সেগুলোও নাম দেখে দেখে যার যার সীটে দিয়ে যাওয়া।

এতো গেল নিত্যকার রুটিন-ধরা কাজ। রুটিনের বাইরে প্রতিদিনকার একহাজারটি ঝামেলা। অমুকের নতুন গেঞ্জিতে ফুটো বেরিয়েছে। অমুকের লুঙ্গির ছেঁড়া পাড় ধরা পড়েছে। অমুকের চশমার কী হল? দাঁতের ডাক্তার এল না কেন? অতএব কালাম ছুটল অফিসে। আর এসব কাজ মানেই কর্তৃপক্ষের সাথে তর্কবিতর্ক খচাখচি যার কোথাও শেষ নেই। দিনভর এসব ঝক্কির দায়িত্ব মেটাতে গিয়ে এক দণ্ড অবসর পায়না কালাম। অবসর যখন জোটে সেই রাত্তির বেলায় ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ তখন জড়িয়ে আসে।

দিনভর তাই কাছে পাইনা কালামকে। পাই সন্ধ্যার পর। কখনো বা গভীর রাত্রে আমার এই জানালাটার পাশে।

দেখ দেখ, এমন পেলব রমনীয় আকাশ কারাগারে দেখেছিস কখনো? হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হল কালাম। ওর চোখ অনুসরণ করে দৃষ্টিটাকে পাঠিয়ে দিলাম বাইরে। রাজহাঁসের পালকের মতন শাদা আকাশ। মনে হয় তুলতুলে নরম। আর মনে হয়, বুঝি অনেক নীচে নেমে এসেছে আকাশটা। হায়তো পূর্ণিমা আমোদিত এই পৃথিবীরই একটি আলিঙ্গনের প্রত্যাশায়।

তেসর পাহারা বুঝি এসে গেছে। দোসরা পাহারা কম্বল আর মানুষের হিসাবটা বুঝিয়ে দিচ্ছে গুণতি ৩৩, কম্বল ১০০।

শুধু বন্দীদের মাথা নয় থালাবাটি মায় হ্যারিকেন অবধি প্রতি প্রহরে গোণার কথা। কারাবিধি অনুযায়ী এটাই নিয়ম। যে ডিউটি বুঝিয়ে দেবে এবং যে বুঝে নেবে উভয় পক্ষেই ওয়ার্ডের ভেতরের কয়েদী পাহারাকে দিয়ে এই গোনাগুণতি মিলিয়ে দেখবার কথা। কিন্তু এই ইংরেজ কানুন উঠে গেছে কবে। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবেই হয়তো এখনো বেঁচে রয়েছে কোন কোন কয়েদী খাতায়। শুধু মাথার গুণতিটা ঠিক রাখতে পারলেই মিয়াসাহেবরা এখন নিশ্চিন্ত। চাকুরীর উপর হাত পড়বেনা।

কয়েকদিন আগে কোন কয়েদী খাতায় কম্বল চুরি গেছে। দু'তিনজন মেট পাহারা সেল-বন্ধ হয়েছে, একজনের পায়ে পড়ছে ডাণ্ডাবেড়ি। সেই সঙ্গে হুকুম জারি হয়েছে তামাম জেল খানায় কমলির সাথে সাথে কম্বলও গুণতে হবে। এ ব্যবস্থায় কম্বল চুরি বন্ধ হয়েছে কিনা জানা যায়নি, তবে কয়েদীরা বলে ঘুম নাকি জেলখানা ছেড়ে পালিয়েছে। প্রহর গুণতির ঠেলায় কয়েদী-প্রাণ অতিষ্ঠ।

এমনিতেই দিনরাত চটে থাকে হাসিব। ও বলে জেলখানায় আটক থাকাটাই অহর্নিশ এক যন্ত্রণা, মেজাজ তো চটবেই। তার উপর আসে এখবর সেখবর অমুককে বেত, মোড়াখাতায় অমুক কয়েদীটাকে ডাণ্ডাবেড়ি। আর অমনি চচ্চড় করে উঠে যায় হাসিবের ভেতরের তাপমাত্রা।

খটখট তালা ঝাঁকুনিতে কানে তালা পড়ার উপক্রম।

অসহ্য! গল্পের আসর ভেঙ্গে উঠে পড়ে খলিল। চোখে মুখে ওর বিরক্তি। তারপর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাতে জ্বালাতে অকস্মাৎ নামিয়ে নিল হাতটা। সনুমামার দিকে ফিরে বলল, বুঝলেন সনুমামা দিনটা হেসে খেলে বেশ যায়। কিন্তু রাতটা একেবারেই অসহ্য। পহরে পহরে হাঁকডাক, তালা খটখটিয়ে ওরা যেন জানিয়ে দিতে চায় আমরা প্রিজনার, আমরা বন্দী। একান্ত কৃপা করে আমাদের জানে মারছেনা।

আপাততঃ কিছু বলবার না পেয়ে সনুমামা অতি অস্ফুট স্বরে শুধু উচ্চারণ করেন, হুঁ।

আর ওই সন্ধ্যাবেলাটা যখন আস্ত মানুষগুলোকে গুরুর মতো গোয়ালে পুরে বন্ধ করে যায়, তখনো এই তালা খটখট। ওই শব্দটা শুনলেই আমার কী ইচ্ছে হয় জানেন? ইচ্ছে হয়, যে জমাদারটা বন্ধ করতে আসে আর যে সিপাইটা তালা খটখট করে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে রেখে দেই ওদের।

হা হা করে হেসে ওঠেন সনুমামা। বলেন, হইছে, বাইচলামি করিস্‌না তুই। সত্যি বলছি সনুমামা। আমার ভয় হয় কোনদিন কী অপকর্ম করে বসি। হামেদ ভাই তো বলেন আমার মনে ধ্বংসাত্মক প্রবণতাটা নাকি বেড়েই চলছে। সিগারেট ধরিয়ে আবার বসে পড়ল খলিল।

হাসিব এতক্ষণ একমনে দরজার দিকে চেয়েছিল। মিয়া সাহেব পুব পাশের গরাদগুলো পরখ করে এখন পশ্চিম দিকে এসেছেন।

চোখ দুটোকে সরু আর কুঞ্চিত করে দেখল হাসিব। চিনল, হ্যাঁ এই সেই মিয়া সায়েব। যার উঁকি মেরে মেরে গুণতি নেয়ার বাতিক। এই মিয়া সায়েব, শোনেন। ডাকল হাসিব।

স্যার কি বলছেন? সনুমামার জানালার দিকে এগিয়ে এলেন মিয়া সায়েব।

আমরা কী বাঘ না ভালুক। অমন উঁকি মেরে মেরে দেখছেন কি?

হাসিবের কড়াগলায় থতোমতো খেয়ে গেলেন মিয়া সায়েব। কেমন আমতা আমতা করে বললেন, এই, মানে গুণতিটা মিলিয়ে দেখছিলাম।

গুণতিটা মি-লি-য়ে দে-খ-ছি-লা-ম। মিয়া সায়েবের কথাটাই মুখ ভ্যাং-চিয়ে উচ্চারণ করল হাসিব। তারপর যেন হুংকার মেরে উঠল– কেন, আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি?

প্রমাদ গুণলাম, এই রাত্তির বেলায় চেঁচামেচি করে কার ঘুম ভাংগিয়ে দেয় হাসিব।

এক পা পিছিয়ে বুঝি হুংকারটা সামলে নিলেন মিয়া সায়েব। যেন অন্যায় করে ফেলছেন তেমনি কুণ্ঠার স্বরে বললেন, কি আর করি আপনাদের এখানে তো পাহারা নেই। থাকলে আমারও এত কষ্ট হত না। আপনাদেরও অসুবিধে হত না।

থাকলে আরো বেশী অসুবিধা হত। সে কথা যাক। গুণতি মিলেছ? জি–।

ঘোড়ার ডিম মিলেছে। গেল কাল গুণতি তিল ৩২। কম্বল ছিল ১০০। আজ একজন ফালতু গেছে নেমে। গুণতি ৩১। কিন্তু কম্বল তো সেই একশোই। এটা কেমন করে হয়?

এ্যা? মিয়াসাহেব সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি কবির জানালার কাছে গিয়ে হাতের স্লিপটা বার দুই তিন পড়লেন। ফিরে এসে বললেন, কিন্তু স্লিপে যে লেখা একশো।

ভুল লেখা আছে। একটু থামল হাসিব। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল বিভ্রান্তদৃষ্টি মিয়াসাহেবের দিকে। বলল, এক কাজ করুন।

বলুন। যেন অকূলে কূল পেতে চায় মিয়াসায়েব। তেমনি আগ্রহভরে চেয়ে থাকে হাসিবের মুখের দিকে। আবারও বলল, বলুন।

এই যে দেখছেন সায়েবরা মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে? এই শোয়াটা একটা মন-বোঝানো ব্যাপার। আসলে কেউ ঘুমোয়নি। ওদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস

করুন কার কাছে কখানা কম্বল রয়েছে। তার সাথে যোগ দিবেন ছয়জন ফালতুর ছয়খানা, আমাদের ক্যারম খেলা খানা-পিনার জন্য এক্সট্রা দশখানা। তাহলেই একেবারে নির্ভুল হিসেবটা পেয়ে যাবেন আপনি।

সায়েবরা যে তেড়ে আসবেন?

এলোই বা তেড়ে। হিসেবে গোলমাল হলে চাকুরী তো আপনার যাবে, সায়েবদের কী হবে?

মিয়াসায়েব চিন্তায় পড়লেন। হাতের স্লিপ কাগজটা দলামোচা পাকিয়ে চলেছেন আর জিবের তালু দিয়ে দুশ্চিন্তার প্রকাশ একরকম শব্দ তুলছেন।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিল খলিল। এবার খিক খিক করে সে হাসির কিছুটা জোর করেই বেরিয়ে পড়ল। সনুমামাও হেসে উঠলেন।

মিয়াসাবে এতক্ষণে বুঝলেন, ওকে টালানো হচ্ছে। বললেন, ও আপনি ঠাট্টা করছেন? বলে অন্য পাশে সরে গেলেন মিয়াসায়েব।

কালামের দায়িত্বটা আমি পালন করলাম। বললাম, খলিল, মন্টু আস্তে কথা বল, নয়তো শুতে যাও। অন্যদের ঘুম ডিসটার্ব হচ্ছে।

ওরা চলে গেল। সনুমামা চিৎ হয়ে শুয়ে পা-দুটো ফাঁক-করে সিগারেট ধরালেন।

চুপচাপ বসে কালাম। চোখ দুটো বাইরে যেখানে জোছনা ফিনিক ছুটিয়েছে। ওর এই নিঃশব্দ বসে থাকার মাঝেই কি এক মাধুর্য যা আকর্ষণ করে দৃঢ়মূল কোন প্রীতির টানের মতন। শুধালাম কিছুই বলছিস না যে?

দেখ চেয়ে পর্ণশশী সেই রবি ঠাকুরের সাধা মেঘের ভেলায় চড়েছে। বুঝি বিহারে চলেছেন।

কালামের মুখে এমন বাক্য বেমানান। তবু খুসি হলাম মনে মনে। যে দুর্ঘটনা যে আঘাত জীবনের আনন্দ ওর নিঃশেষে শুকিয়ে দিতে পারত সে আঘাত থেকে অক্ষত বেরিয়ে আসছে ও। হয়তো ভেতরের ক্ষতটা মুছে যায়নি এখনো, মুছবার নয় কখনো। তবু ধীরে ধীরে হাসি আর আনন্দের প্রলেপ মেখে মেখে ক্ষতের যন্ত্রণাটা সহনীয় করে এনেছে কালাম।

কথাবার্তাটা চালু রাখার উদ্দেশেই বললাম, কবি কিন্তু তোমার কল্পনায় খুসি হবেনা। বলবে, সেকেলে এবং রোমান্টিক। ওরা তো চাঁদ সম্পর্কে অন্য রকম ভাবে।

যেমন?

যেমন "পুর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

কিন্তু উপমাটা তো চমৎকার।

শুধালাম, কোন অর্থে চমৎকার– সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজম?

কাব্যিক অর্থে। এটা রোমান্টিক, ওটা বাস্তবধর্মী, কাব্যে সাহিত্যে শিল্পের ক্ষেত্রে এই চুলচেরা বিভাগ অন্ততঃ আজকের দিনে সত্যি অনুচিত। যাকে রোমান্টিক বলি তা যে সবসময় বাস্তববর্জিত এমন কথা বলা চলে না। তেমনি যাকে বলি বাস্তবধর্মী সাহিত্য তার মাঝে রোমান্টিকতার গন্ধ নেই, এমন দাবী বোধহয় কোন শিল্পীর পক্ষেই করা সম্ভব নয়। শেখভ বা মায়াকোভস্কি পড়ে তোর কি একথাই মনে হবে না?

বুঝলাম তর্কের মেজাজ এসে গেছে। বললাম বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে রোমান্টিকতার একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। এক এক ধারা বিশেষ কালের বিশেষ যুগের। এ ধারার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেই সাহিত্যে শিল্পে বাস্তববাদী ধারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর এ দু'য়ের বিভাগটাকেই অস্বীকার করছিস তুই? কি আছে বা নেই সে কথা তো হচ্ছে না। কথা হচ্ছে উচিত অনুচিতের। গজদন্তমিনার সাহিত্য আজ ধিক্কৃত, যেমন ধিক্কৃত বাস্তববাদী সাহিত্যের নামে অসাহিত্য, স্থূল প্রচারণা। এ দুটো অনুচিত সম্পর্কে আজ আর প্রশ্ন নেই, দ্বিধা নেই। আজ তাই নতুন কথা শুনি, বাস্তবের রোমান্টিকতা, সমাজতান্ত্রিক দোশের সোস্যালিষ্ট রোমান্টিসিজন ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুলিয়ে ফেলছিস–

হাতের তালু উঁচিয়ে আমায় থামিয়ে দিল কালাম। বলল, না গুলিয়ে ফেলছি না। সাহিত্যে শিল্পে যেমন থাকবে বাস্তব তেমনি থাকবে রোমান্টিকতা। কথাটা আপাতঃ দৃষ্টিতে স্ববিরোধী। কিন্তু মনে রাখিস এটা জীবনেরই তাগিদ। আর যা জীবনের তাগিদ তাই তো সাহিত্য। তাগিদটাই সাহিত্যের মৌলিক উপাদান।

প্রতিবাদে দীর্ঘ একটা বিবৃতি তৈরী করছিলাম। কিন্তু কালামের আঙ্গুলের ইসারা পেয়ে থেমে গেলাম। সনুমামা একটু অসহিষ্ণুভাবেই ঘন ঘন পাশ ফিরছেন– যার অর্থ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে ঘুমের।

উঠতে গিয়েও উঠল না কালাম। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। যে রাতটুকু গরাদ ভেংগে লুটিয়ে পড়ছিল ঘরের মেঝেতে সেটা এখন সরে গেছে। শিকের উপর ন্যস্ত কালামের মুখময় শুভ্র মেঘের মতো এক টুকরো জোছনা। বললাম, এ অবস্থায় তোর কিছু বলা উচিত, এক পংক্তি কবিতা, অথবা দু'লাইন গান, কি বলিস?

কিছু না বলে ছোট্ট একটু হাসল কালাম। ওর মুখে লেপে-থাকা চাঁদের আলোটুকুর মতোই স্নিগ্ধ হাসি। হঠাৎ দেখি মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেলিমভাই।

ঘরের এ মাথা ও মাথা অবধি দ্রুত পায়চারী করছেন আর ডান হাতের তালুটা ঘন ঘন বুলিয়ে চলেছেন মাথার টাকে। এ রকমটি প্রায়ই হচ্ছে আজকাল। শুয়ে রয়েছেন অথবা বসে বসে বই পড়ছেন, হঠাৎ উঠে জোরে জোরে হাঁটা শুরু করলেন সেলিম ভাই। আর হাতের তালুতে সেই মাথা ঘঁসা। প্রথম প্রথম অনেকেরই নজর পড়েনি। এখন দুবাড়ি মিলেই আমরা উদ্বিগ্ন, কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কালামের দিকে তাকালাম। এক দৃষ্টিতে সেলিম ভাইকেই লক্ষ্য করছে ও।

হাঁটতে হাঁটতেই টেবিল থেকে তামাকপাতার কৌটোটা তুলে নিলেন সেলিমভাই। ছিঁড়ে নিলেন দু'আঙ্গুল পরিমাণ পাতা। নখ দিয়ে কুচি কুচি করে রাখলে বাঁ হাতের তালুতে, তারপর এক নখ চুন মিলিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডলে চললেন কুচিগুলো। ডলা খেয়ে খেয়ে এক সময় তৈরী হয়ে গেল খৈনি। খৈনিটা নীচের পাটি দাঁত আর ঠোঁটের মাঝখানে পুরে আবার পায়চারি শুরু করলেন সেলিমভাই। সারা দেহ আর মন জুড়ে তাঁর কী যেন প্রলয় চলছে। সে প্রলয় কখন কোন উন্মত্ত হুংকারে ফেটে পড়বে কে জানে! আশংকায় দুরু দুরু কাঁপে বুক। শুধু আমার নয়, দু বাড়ির সব কটি মানুষের বুকে এ এক উদ্বেগের পীড়ন।

জোরে জোরে হাঁটছেন, জোরে জোরে পা ফেলছেন সেলিমভাই। চটাশ চটাশ নিস্তব্ধ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরছে স্যাণ্ডেলের আওয়াজটা। এ যেন কোন অক্ষম প্রতিবাদ, পথ না পেয়ে অন্ধ দোয়ালে মাথা কুটে মরছে। এতে সকলেরই ঘুম ভেংগে যায়। অনেকেই বিরক্ত হন। কিন্তু এটা প্রতিবাদের বিষয় নয়, ধৈর্য আর সহানুভূতি দিয়ে সহ্য করে যাওয়ার ব্যাপার। মুখ বের করে

একবারটি দেখেই যে যার মতন শুয়ে পড়ে আবার, ঘুম না এলেও শুয়ে থাকে চুপচাপ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখটা আবার বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নিল কালাম। শিকের ফাঁকে নাকটা গলিয়ে দিয়ে কি যেন দেখল বাইরে। শুধালাম, কী দেখছিস রে?

দেখছি বৈশাখী পূর্ণিমার স্বচ্ছ জ্যোতি। যতই প্রহর বাড়ছে, কী এক দিব্য ছটায় ফুটে উঠেছে রাতের মহিমা। এমন রাত্রি শুধু জেগে থাকার রাত্রি।

আর বিশেষ একজনকে আপনার পাশে বসিয়ে একান্ত ভাবে কল্পনা করার রাত্রি, রহস্য করেই বললাম।

মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধ কী বলেছিলেন মনে আছে তোর? হঠাৎ শুধাল কালাম।

মনে নেই। কী বলেছিলেন?

পীড়িত মানবতাকে বাণী দিয়েছিলেন তিনি– শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ স্মৃতি পুণ্য কর্ম সত্য ধ্যান-এ পথেই মুক্তি। বলেই উঠে গেল কালাম। সেলিম-ভাইর কাঁধে হাত রেখে কী যেন বলল। প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করলে সেলিমভাই কিন্তু কালামের হাতের আকর্ষণে তাকে যেতেই হল বিছানার দিকে। তারপর ওকে শুইয়ে দিল কালাম।

বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভ্রতামাখা অংগনের দিকে চেয়ে থাকি নির্নিমেষ।

অংগনজুড়ে উজ্জ্বল রাত্রির নিরঙ্কুশ রাজত্ব দরাগত কোন সংগীতের মত এখনো বেজে চলেছে আমার কানে– শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ স্মৃতি পূর্ণ্য কর্ম সত্য ধ্যান ----------।

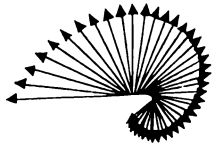

পঁচিশে বৈশাখ

চারিদিকের উঁচু প্রাচীরে বাতাস রুদ্ধ। মাথার ওপরে করুণাহীন সূর্যটা কী এক আক্রোশে সকাল থেকেই যেন আগুন ঢালতে শুরু করছে। সে আগুনে দগ্ধ হয়ে চলেছি।

এমনি গরমে রুদ্ধ কপাঠ পৃথিবীর প্রাণগুলো ছটফটিয়ে মরছে অথচ অবাক হয়ে দেখি যতই বাড়ছে বৈশাখী রোদের তীব্রতা ততই গাঢ় হয়ে চলেছে পাতার সবুজ।

প্রকৃতির অগ্নিরোষ উপেক্ষা করেই পাতায় পাতায় ভরে গেছে শিউলী গাছটা। শিউলী তলায় এখন ঘন পাতার ছায়া। অদূরের নিম গাছটা কখন নবপত্র শোভায় ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে খলখলিয়ে উঠেছে। প্রাচীরের ওপারে সেপাই ব্যারাকের সুমুখে প্রকাণ্ড বাদাম গাছ। বাদাম গাছটা পেকে লাল হয়ে যাওয়া পুরনো পাতার সব কটিই ঝেড়ে ফেলেছে, পথ করেছে সবুজ পাতার।

প্রকৃতির অগ্নিরোষ উপেক্ষা করেই পাতায় পাতায় ভরে গেছে শিউলী গাছটা। শিউলী তলায় এখন ঘন পাতার ছায়া। অদূরের নিম গাছটা কখন নবপত্র শোভায় ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে খলখলিয়ে উঠেছে। প্রাচীরের ওপারে সেপাই ব্যারাকের সুমুখে প্রকাণ্ড বাদাম গাছ। বাদাম গাছটা পেকে লাল হয়ে যাওয়া পুরনো পাতার সব কটিই ঝেড়ে ফেলেছে, পথ করেছে সবুজ পাতার।

এক নম্বর ঘরের পর কিনারের বড় পাঁচিল ঘেঁসে একফালি বাগান। এ কয়দিন পানি পড়েনি। বাগানের মাটি ফেটে চৌচির। কিন্তু এই বিদীর্ণ মাটির বুকেও গ্রীষ্মের সবুজ মেলে দিয়েছে আপন সম্ভার। ফুলের ভারে আনত হাসনা হেনার ডাল। এক কোণায় একটি পুঁইলতা। খর-তাপের সাথে পাল্লা দিয়েই যেন লকলকিয়ে বেড়ে চলেছে তার কচি সবুজ দেহখানি। বাগানের দুপাশে দুইটি জুঁই ঝোপ। ফুলের নীচে চাপা পড়েছে তার পাতা। শাদা নাকফুলের মতো ছোট ছোট ফুল, গোলাকার ঝোপটাকে ঘিরে থরেবিথরে ফুটে রয়েছে অজস্র। দূর থেকে মনে হয় শুভ্র বরফ কুচির ঘনবুনোট টোপর পড়েছে জুঁই ঝোপ।

বিস্ফোরিত চোখে আমি চেয়ে থাকি। রুক্ষতার বুকেও কি আশ্চর্য প্রাণের অভিসার। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে কী স্পর্ধিত বিদ্রোহ। ফুলের ভারে আনত

হাসনাহেনা, সবুজের নির্যাসে লাবণ্যময়ী পুঁইলতা, সাদা ফুলের টোপর পরা জুঁই ঝোপ, শেফালী পাতার গাঢ় কালচে সবুজ, চিকন পাতা নিমডালের সবুজ চামর ব্যাজন– সবই যেন কোন অমিততেজ প্রাণের জয়-যাত্রা। এ প্রাণ এদেশের জলবায়ু মাটির রসে সিক্ত। এ প্রাণ অবিনশ্বর। সহস্র প্রতিকূলতার মুখেও এ প্রাণ ঝলোমলো সবুজে দীপ্যমান।

এ প্রাণ রবি ঠাকুরের কবিতায়। এ প্রাণ রবীন্দ্র সংগীতের সূক্ষ্ম কারুকর্মিতায়, শব্দ পদ তানের বিচিত্র ঝংকারে। এ প্রাণ বিশ্বময় আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সহস্রধারায়, অজস্র চরিতার্থতায়। রবি ঠাকুরের মতো আর কোন্ কবি এ সবুজ প্রাণকে আপন আত্মার আধারে একান্ত করে ধরতে পেরেছিলেন?

মনে হয় এই মাস এই গ্রীষ্ম ঋতু ছাড়া অন্য কোন মাসে অন্য কোন ঋতুতেই সার্থক হত না রবীন্দ্রজন্ম।

রশিদ, হাসিব খলিল সবাই মিলে ফুল চয়ন করছে আজকের দিনের জন্যে। মুঠো ভরে জুঁই ফুল তুলেছে, হাসনাহেনার ডাল ভেংগেছে। জুঁই ফুলের মালা গেঁথেছে। প্রজাপতির মতো বিচিত্রবর্ণা কলাবতী, ভুঁইচাপা অকালের ডায়ানথাস বেলি যেখানে যে ফুল পেয়েছে তাই চয়ন করেছে। বিকেলের দিকে দেখা গেল সাদা ফরাসের চারিপাশে আর মধ্যেখানে গোটা বাগানটাই উপড়ে এনে নতুন করে সাজিয়েছে ওরা।

সনুমামা বললেন, আমি তো মুখ্য সুখ্য মানুষ। তবে শুনেছি এমনি দেশীয় ফুল লতাপাতা দিয়ে আপনাকে ঘিরে রাখতে ভালোবাসতেন বিশ্বকবি।

ফকিরভাই সমজদার মানুষ। বললেন চমৎকার। পাতা আর ফুলের বিন্যাসটি খাসা। এমন সুন্দর করে কে সাজালো হে?

ফকিরাভাইর জিজ্ঞাসাটা বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্যে করে নয়। এর জবাব না দিলেও চলে। কিন্তু ফরাসের দূর কোণ থেকে একটা তেরছা দৃষ্টি হেনে হাসিব বলল, বিশিষ্ট কেউ না। আমরা সকলে।

ও, তা বেশ বেশ, খাসা হয়েছে কিন্তু। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন ফকিরভাই।

মহাকবির স্মৃতি তর্পণের সভা যেমনটি হওয়া উচিত এবং কারাগারের এই ক্ষুদ্র কক্ষে যেমনটি হওয়া সম্ভব তেমনই হল। মন্টু গাইল উদ্বো-ধনী সংগীত। গাইল শুকনো গাঙে বান ডাকার সেই বহু-গাওয়া গান। হাসিব পড়ল লিখিত

প্রবন্ধ। প্রবন্ধে আলোচনা করল, ডাহুক ডাকা পদ্মার চর, পদ্মার পানি, দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত– ঋতুতে ঋতুতে পূর্ব বঙ্গের তরুলতা আকাশ মাটির বিচিত্র সৌন্দর্য কেমন করে প্রভাবিত করেছে কবির সৃষ্টিকে।

চিরকুটে পয়েন্ট দেখে দেখে বক্তৃতা করল কালাম। বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে ও আলোচনা করল কেমন করে বিশ্বমানবতার ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কবি। কালাম বলল দেশপ্রেমের সাথে বিশ্বপ্রেম এবং মানবপ্রেম মিলেই কবির সৃষ্টিতে এসেছে বিশ্বের সার্বজনীন আবেদন।

বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে গান এবং আবৃত্তি হল গুটিচার। সবশেষে আপন জন্মদিনে আপনাকে উদ্দেশ্য করে যে কবিতাটি লিখছিলেন কবি সেটা আবৃত্তি করল আমাদের রাজবন্দী কবি,

"জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গনতলে লহো আপনার স্থান–
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।"

এ প্রসংগে যারা বলেন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর কবি, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের কবি নন, তাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ছুঁড়ে মারল কালাম। কালাম বলল রবীন্দ্রনাথ সারা বাংলার কবি, হিন্দু মুসলমান সকল বাঙগালীর কবি; রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিই পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভাষার মর্যাদা ছিনিয়ে এনেছে বাংলার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আসরের মতো রুচি আর পরিচ্ছন্নতার তৃপ্তির ভেতর দিয়েই শেষ হল মহাকবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান। সভাও শেষ হল আর শুরু হল তুমুল বিতণ্ডা। দেখা গেল কালামের বক্তৃতায় তর্ক করার মতো পয়েন্টের অভাব নেই।

তর্কের প্রাথম প্রশ্নটা এল মান্নানের কাছ থেকে। ওর প্রশ্ন রবিঠাকুর যে মূলতঃ হিন্দুর কবি এ সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে আমাদের আপত্তি কেন?

উত্তর দিল খলিল। আপত্তি এই কারণে যে, কথাটা আদৌ সত্যি নয়। আপত্তি এই কারণে যে, যে সব মোল্লারা একদা নজরুলকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিল তারা এবং তাদেরই সাগরেদগুলো আজ আবার তারস্বরে চিল্লিয়ে

চলেছে রবি ঠাকুর মুসলমানের কবি নন। এরাই মনে করে যে বাংলা ভাষাটাও মুসলমানদের ভাষা নয়। এরাই একদিন যুক্তি দিয়েছিলেন মুসলমানদের ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

ওই গর্ভস্রাবগুলোর কথা বাদ দাও। ওদের চিনতে কারো বাকী নেই। আমার কথাটা হল রবি ঠাকুর হিন্দু–

থাম। মান্নানের কথাটা শেষ হবার আগেই থামিয়ে দিল খলিল। চিত্রা বলাকা, গীতাঞ্জলি সোনার তরী, শংসপ্তক, এতো যে কবিতার বই এর থেকে অন্ততঃ একটি কবিতা বেছে নিয়ে বলতে পার এটি হিন্দুর কবিতা এটি মুসলমানের নয়।

প্রতিবাদ করে উঠল মান্নান, প্রশ্নটাকে এভাবে উপস্থিত করার অর্থ ডিসটরসন, গ্রস ডিটরসন। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে যে চেতনা, যে মানসিকতার সন্ধান পাই যাকে এক কথায় আমরা বলি রবীন্দ্র-মানস, সেটা কি? সে তো একান্তভাবেই একটা হিন্দুমানস।

এটাও ঠিক নয়। তুমি জান, ধর্মমতের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন না?

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন–।

অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম, একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তোমরা মুসলমানরাও একথাই বল। অতএব–

এমন ভাবে বলছ যেন তুমি মুসলমান নও। ফোঁড়ন কাটল মান্নান।

আহ্ কথার সময় বাধা দাও কেন? আমি খৃস্টান নই হিন্দু নই মুসলমান নই। আমি মানুষ একথা তো একশো দিন বলেছি। হ্যাঁ যা বলছিলাম। অতএব রবীন্দ্রনাথের সাথে হিন্দু ধর্মের যতটা দূরত্ব ঠিক ততটাই তার নৈকট্য ইসলামের সাথে। দ্বিতীয়তঃ তাকাও তার কাব্যের দিকে। কি দেখবে? দেখবে যেমন উপনিষদ তাঁর প্রেরণা তেমনি হাফিজ সাদীর মরমীবাদ অন্তঃসলিলা স্রোতের মতো প্রবাহিত তার কাব্য সাধনায়। দেখবে পশ্চিমের রোমান্টিক ভাবধারা কেমন সহজ তরংগের স্বভাবে আছড়ে পড়ছে তার সৃষ্টির তটে। এ সত্ত্বেও কি তুমি বলবে রবীন্দ্র-মানস হিন্দুমানস?

খলিলের স্বরটা যেমন তেড়িয়া তেমনি মুখচোখের ভাবটাও মারমুখো। ফলে মান্নানের স্বরটা চড়ল আর এক পর্দা। আমি বলছি ফাণ্ডামেন্টালি মানে মূলতঃ রবীন্দ্র চেতনায় যে ধর্মী সুর আর সেটা যে হিন্দুধর্মিক এটা কি সত্য নয়?

খেঁকিয়ে উঠল খলিল– দেখ, হাওয়ায় কথা বলোনা। বিদগ্ধ জনের ঢঙ্-এ ঘুরিয়ে বললেও আসলে তোমার কথায় ওই মোল্লাদেরই কথা। আমাকে নির্দ্দিষ্ট করে তুমি দেখাও তো রবীন্দ্রঠাকুরের কোন্ কবিতায় কোন্ বইতে এই হিন্দুধর্মিক মনের পরিচয় পেয়েছে?

সব বইতে সব লেখায়। চিল্লিয়ে উঠল মান্নান। বলল আবার, এতো এতো নভেল নাটক গল্প লিখলেন জীবনভর কিন্তু এক ডালিয়া ছাড়া মুসলিম নায়কনায়িকা নিয়ে তাঁর একটি গল্প কি উপন্যাসের নাম করতে পার? অথচ যে ভাষা তার এতো প্রিয় যে ভাষায় সৃষ্টি করে গেলেন আজীবন সে ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মাঝে মুসলিমরাই তো সংখ্যাধিক। এটাকে কি বলবে শুনি?

বলতে চাও কি তুমি! রবীন্দ্রনাথ সাম্পদায়িক? চোখটাকে চালের মতো সরু করে শুধাল খলিল।

নিশ্চয়। রামমোহন থেকে কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম মিলে যা গড়লেন যার নাম বাংলার রেনেঁসা, সে তো আসলে হিন্দুর রেনেঁসা, মূলতঃ হিন্দবাদের পুনরভ্যুত্থান। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ এই রেনেঁসারই ধারক এবং বাহক।

হল কি, তোমাকে কী আজ 'মূলের' রোগে পেল নাকি? কথার মাঝখানেই ভেংচিয়ে উঠল খলিল।

ইউ সি খলিল, আই ডোন্ট লাইক ফিলিবাষ্টারিং। চোখে দুটোকে বাঁটুল আর লাল করে তাকাল মান্নান।

আচ্ছা বল বল, আমরা শ্রোতারাই বলে উঠলাম।

ঠিক তেমনি যে জাতীয়তাবাদ জাগল ভারতবর্ষে সেও সাম্প্রদায়িক পথেই। ভারতের জাতীয়তাবাদ মূলতঃ হিন্দু সভিনিজম। এই যে হিন্দুর রেণেঁসা, হিন্দুর জাতীয়তাবাদ, রবীন্দ্রনাথ কি এর বাইরে এসে নতুন পথ কেটে নিতে পেরেছিলেন? পারেননি। পারেননি বলেই তাঁর এই বিপুল সৃষ্টিতে তুমি আমি স্থান পাইনি। অর্থ্যাৎ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠার মতো মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না, এই সত্য–

থামো থামো। লজিকে এটাকে বলে ফ্যালাসি। মোটামুটি সঠিক বিশ্লেষণ থেকে তুমি কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছ। যে হিন্দু জাত্যাভিমান আর সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তোমার ক্ষোভ সেটা কিন্তু তুমি আর একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী থেকেই প্রকাশ করছো। অর্থাৎ সাদামাটা কথায় বলছি বলে কিছু মনে

করো না। রবি ঠাকুর যদি রবীন্দ্রনাথ না হয়ে রবিউদ্দিন কিংবা রহিমঠাকুর হতেন তুমি তাঁকে মাথায় তুলে নাচতে। এই তো? এটা স্রেফ মুসলিম সভনিজম। হিন্দুর পালটা চোখে ঠুলি এঁটে শুধু মুসলমান হিসেবেই যদি দেখ তা হলে হাউ ক্যান ইউ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড রবি ঠাকুর, কেমন করে বুঝবে রবীন্দ্রনাথকে?

কদর্থ, কদর্থ করা হচ্ছে আমার বক্তব্যের। চেঁচিয়ে উঠল মান্নান।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লক-আপে যাবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অনুনয় বিনয় করছিল জমাদার। এবার তিনিও গলাটাকে উঁচিয়ে বরলেন, চলিয়ে চলিয়ে বাবু-সাব। অন্দরমে যত্-তো খুসি বহস করিয়ে।

লক-আপ হয়ে গেলেও তর্ক থামলো না। ও বাড়িতে খলিলের পক্ষে দাঁড়াল রশিদ। চললো ধুম তর্ক। সাড়ে আটটা খাওয়ার সময়। খেতে বসেও তর্ক থামাল না, খাওয়া এবং তর্ক উভয়ে দিকে মুখ চলল সমানে। খাওয়ার পরও তর্কের ফিনকি ছুটিয়ে দুবাড়ি উত্তপ্ত করে রাখল ওরা।

তর্ক উঠলে আর থামতে চায়না। এ বুঝি জেল খানার এক ব্যাধি। তর্কে তর্কে এমনও হয়েছে কী ছিল তর্কের বিষয় শেষ পর্যন্ত তার্কিকদের সে খেয়ালটাই থাকে না। তর্কের মূল চাপা পড়ে শাখা প্রশাখাই হয়ে ওঠে প্রধান। তর্কেবিতর্কে যে আমার অরুচি এমন নয়, বরং মনে করি এটা মানসিক সজীবতা এবং স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। কিন্তু তর্কটা যখনি ঘোরালো আর উত্তপ্ত কথা কাটা কাটিতে রূপান্তরিত হয় তখনি দমটা আমার বন্ধ হয়ে আসে। আমি পালিয়ে যাই।

খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম।

কালাম হস্তক্ষেপ করেছে ওদের বিতর্কে।

এবার কোন এক যায়গায় একটা দাঁড়ি টানা হয়ত সম্ভব হবে। কালামের কথাগুলো কানে আসছে।

কালাতীত যুগাতীত প্রতিভা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই বাস্তবে। রবিঠাকুরকে তার কাল দিয়ে তার যুগের ইতিহাস দিয়ে বিচার করতে হবে। নইলে যতো তর্কই করনা তোমরা, রবীন্দ্র প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন কিছুতেই করতে পারবে না। একটু থেমে সিগারেটে দম দিল কালাম। ধোঁয়াটা ছাড়তে ছাড়তে বলল আবার, রবীন্দ্রনাথের একটা বড় গুণ তিনি আপন জীবনের অনেক ব্যর্থতা অনেক অসমাপ্ত কর্মের কাথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন। সমাজের একেবারে নীচু তলায় তিনি পৌঁছাতে পারেন নি, সে আক্ষেপ তিনি রেখে গেছেন

আগামী কালের কবিদের জন্য। মুসলমানদের নিয়ে তিনি কিছু লিখেন নি। ওই নীচু তলার জীবনের মতোই মুসলিম জীবনের সাথে তাঁর অনিবার্য দূরত্ব হেতুই এটা সম্ভবপর হয়নি। এ কথাটা কবি নিজেই তো স্বীকার করে গেছেন। অমন যে দরদীমন শরৎবাবুর, তিনিও তো ওই একই কারণে লিখতে পারলেন না। আমার তো মনে হয় মনগড়া কিছু লিখার চাইতে একেবারে না লিখে ভালই করেছেন তাঁরা। নিজেদের প্রতি যেমন সততার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি সম্ভাব্য অকথন এবং বিকৃতির হাত থেকেও রক্ষা করে গেছেন ভবিষ্যৎ বংশধর অর্থাৎ আমাদের।

নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য থামল কালাম। তারপর ইতি টানলো লম্বা বক্তব্যের-অতএব যে দোষে রবি ঠাকুর দুষ্ট নন অহেতুক সে দোষই তাঁর উপর আরোপ করে তাঁর বিচারে বসাটা কি উচিত?

কালামের বক্তৃতা থামলেও তর্ক থামল না। হাসিব তখ্‌খুনি বলে উঠল মুসলিম জীবন নিয়ে রচনা তিনি না হয় নাই করলেন সে ভার দিয়ে গেলেন আগামী কালের সার্থকতর স্রষ্টার হাতে। কিন্তু দর্শন, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সম্পর্কে তিনি তো বক্তৃতা কম দেননি? প্রবন্ধও কম লেখেননি। সেখানেও তো তিনি "অপমানে হতে হবে সবার সমান" এ বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট, আরো শাণিত করতে পারতেন? আসলে তিনি তদানীন্তন রাজনীতিবিদ এবং সমাজনেতাদের মতই হিন্দু মুসলিম সমস্যাটাকে সমস্যা হিসেবেই দেখেন নি। আর এর ফলটা যে কি হল সে তো হাতে হাতেই দেখছি আমরা। আজ একান্ত মামুলি সত্যটিকে সত্য বলে দাবী করতে গিয়েও নতুন করে মূল্য দিতে হচ্ছে, শতাব্দীর অচলায়তনে মাথা কুটে মরতে হচ্ছে। সত্যি কালাম ভাই, রবিঠাকুর কি আমার এই কষ্টটা কিছুমাত্রায় লাঘব করে যেতে পারতেন না?

উঠে চলে এলাম ঘরের উল্টো কোণে যেখানে কবির চেয়ারটা শূন্য। কবিও মেতেছে তর্কে, লক আপের পর বিছানামুখো হয়নি এখানো।

দশটা বেজে তিরিশ। মিনিট পনোরো বাদেই গুমটি ঘরে রাত এগারোটার ঘন্টি পেটাবে। কবির চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম ওর গরাদের পাশে।

মৃদু ঝলকে বাতাস বইছে। বাতাসে চেনা ফুলের মিষ্টি সুবাস। হাসনাহেনার মৌনী সৌরভে ভরে গেছে রুদ্ধদ্বার কারাগৃহ। আমার মনে হল কারারাত্রির বুক জুড়ে আজ কি এক সুখের কম্পন।

চেঁচিয়ে ডাকলাম কবিকে। তর্কে তর্কে কী হারাচ্ছ কবি, তুমি জান না। এসো এদিকে, তোমার লোহার গরাদে আজ ফুলের আঘাত।

পাঁচই জ্যৈষ্ঠ

কিছুই ভালো লাগে না। বই না। পুস্তক না। খেলা না। গল্প না।

কেন যেন এমনটি হয় মাঝে মাঝে। কোন কিছুতেই মন বসে না। কোন কিছুই ভাল লাগতে চায় না।

ভালো লাগেনা রোজ ঘুম ভেংগে দেখা সেই অপরিবর্তনীয় কয়েকটা মুখ। মুখগুলি যেন মূর্তিমান বিতৃষ্ণা। আর এই বর্ণহীন সাদাটে দেয়ালগুলো, জল্লাদের রক্তচক্ষুর মতো চেয়ে থাকা ওই লাল প্রাচীর, মাথায় যার ছাতা জমেছে,শ্যাওলা পড়েছে কাঁধে পিঠে– এই নিশ্চল পাষাণ প্রহরীদের চেহারা কোন দিনও কি একটু বদলাবেনা, বদলাতে পারেনা? নির্মম রুক্ষ চেহারায় ঘাতকের হুমকি হয়ে চেয়ে থাকে সারাক্ষণ। সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় অপহৃত আমার স্বাধীনতা, আমি বন্দী। জবরদস্তি করে মনটাকে হেঁচড়ে টেনে বসলাম গিয়ে চেয়ারে। কিন্তু মন কি আর বাঁধন মানে? লেত্তির বাঁধন থেকে ছুটে যাওয়া লাট্টুর মতো ভোঁ ভোঁ করে কোথায় কোথায় ঘুরে চলে।

ক্রিক প্রিয় গান গাইতে গাইতে ওরা এসে বসেছে প্রাচীরের ছাতাপড়া মাথায়। এ দুবাড়ির সবাই চেনে ওদের।

ওরা শুকসারী। এক জনের পায়ের দুটো নখ কবে কেমন করে যেন খসে গেছে। হাঁটার সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। গেল বছর দুটো বাচ্চা হয়েছে ওদের। নিকটের কোন গাছে এখনো বাবা-মার সাথেই বুঝি থাকে ওরা। রোজকার মতো আজও বাবা মার পিছু পিছু ওরাও এসেছে, বাগানে হেঁটে হেঁটে পোকা খাচ্ছে।

শুক আদর দিচ্ছে সারীকে। শুকের মুখের ভেতর মুখ পুরে আদর খেয়ে চলেছে সারী আর আধো-ব্যক্ত সুখের গুঞ্জন তুলে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়ে চলেছে পালক পুচ্ছ। কিন্তু এ-ও একঘেঁয়ে। ভালো লাগেনা।

কেন ভালো লাগেনা? যে পৃথিবীটাকে ফেলে এসেছি, যাকে আমি ভালোবাসি, যার আলোবাতাস থেকে আমি বঞ্চিত, সে পৃথিবীটাকে মনে পড়ছে বলে? অথবা গোমতী নদীর তীরে বকুলঢালি গ্রামটির কথা স্মরণ করে? যেখানে ছোট ভাই বোন আর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একদা একটি গৃহ ছিল আমার।

না ওসব কথা মনের আনাচে কানাচেও নেই এখন। কচিৎ এসব কথা মনে আসে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, বাহিরের কথাটা এতো কম মনে পড়ে কেন আমার? মাঝে মাঝে প্রতিক্ষারতা সেই মাতৃমুখখানি যেখানে হয়তো সদ্য শুকিয়ে যাওয়া কান্নার দাগ, কল্পনায় চোখের উপর দিয়ে দৌড়ে যায় মুহূর্তের জন্য। কিন্তু ভাই আর বোনটি? ওদের মুখের গড়ন কিছুতেই মনে করতে পারি না। এমন কি আমাদের বড় ঘরের পেছনের যে কদমগাছ। অশৈশব যার সাথে আমার নিবিড় সখ্য সম্পর্ক, সেই প্রিয় গাছটার কথা কালেভদ্রেও বুঝি মনে পড়ে না। আরো মারাত্মক কিছু মনে হয় আমার। মনে হয় কর্মে আর কোলাহলে চঞ্চল সেই যে এক পৃথিবী, দুরন্ত বেগে যেখানে ছুটে চলেছে জীবনের রথ, সে পৃথিবী যেন বহু দূরের, সে পৃথিবীর কথা ভুলে গেছি আমি।

এ রকম মনে হওয়াটা কি স্বাভাবিক? স্বাভাবিক নয়। জড়দগব হইনি তবু কোথাও যেন জড়তা এসেছে। চিন্তায় এবং চৈতন্যে এমন এক ধরনরে শৈথিল্য এসেছে যার নাম হয়ত স্থবিরতা। হ্যাঁ, তাই হবে। নইলে খলিল, হাসিব, মন্টু আর রশিদ, যখন দেখি বাইরের পৃথিবী ছায়া ফেলেছে ওদের চোখে, ওদের চোখে ফেলে আসা সেই চলমান পৃথিবীর হাতছানি, যখন গোল হয়ে ঘরের কথা বৌ ছেলে মেয়ের কথা, ক্ষেত কারখানার কথা, আপন আপন কর্মভূমির কথা, বলতে বলতে নিজেদের হারিয়ে ফেলছে ওরা, তখন আপনার মাঝে কেন তার প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই না আমি? তখন কেন এত অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে? উদার উন্মুক্ত প্রান্তর, আলো ভরা বাতাস খেলা পৃথিবী, আমার এই প্রিয় বস্তুগুলোর কথা আমি ভাবি না। আনমনা হইনা। কথাটা কি আমি প্রকাশ করতে পারি? পারি না। কিছুটা ভয়, কিছুটা সংকোচ। শুনতে বন্ধুরা বলবে তোমার মাঝে হতাশা আসছে, জীবনপ্রেষা হারিয়ে ফেলছ তুমি।

কালামকে একদিন বলেছিলাম– বাইরেও দিন রাত খেটে খেটে মরিস। এখানে এত না খাটলে কি চলে না? কিছু কাজ আমাকেও করতে দে। তাছাড়া তোর পুরো বিশ্রাম দরকার।

ভুল করছিস। বাইরেই বিশ্রামের প্রয়োজন। এখানে সারাক্ষণের বিশ্রাম, ফোর্সড্ লেইসার, জবরদস্তি অবসর। তাই হাত পা বিশেষ করে মনটাকে সর্বক্ষণ সচল রাখতে হবে। কাজ, লেখা পড়া খেলা ধুলো– যার যেমন রুচি এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যাস্ত থাকতে হবে। নইলে শরীরে আসবে অবসাদ, মনে

আসবে স্থবিরতা। কিছু করার নেই? তবে তাস খেল, হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাক চাতালে নেমে দৌড়াও। জেলখানায় কখনো অলস চুপচাপ থাকতে নেই। বুঝলি?

কালামের কথার শতভাগই সত্য। শুধু এবার নয় এর আগেও দীর্ঘ কারামেয়াদ কাটিয়ে গেছি ওর সাথে। সেবার পাশাপাশি সিটে। তখনো দেখেছি আশ্চর্য প্রানবন্ত কালাম। দিব্যি হেসে খেলে অন্যদের হাসিয়ে মাতিয়ে, অনুক্ষণ ব্যস্ত থেকে, যেন ফুৎকারে কাবার করে দিল কারাবাসটা। বার বার অবাক হয়ে ভেবেছি এই অন্ধকুঠিতেও এত কর্মের প্রেরণা, এত প্রাণশক্তি কোথায় পায় ও?

মনে রাখিস হামেদ এ এক অস্বাভাবিক জীবন। আরো বলেছিল কালাম। বাইরে চলমান পৃথিবীতে জীবন গতিশীল। স্রোতের মতো কোন আবিলতাই সেখানে জমাট বাঁধতে পারেনা। কিন্তু এখানে? দেখছিসনা কত ছুতানাতা তুচ্ছাতিতুচ্ছসব ব্যাপার নিয়ে ক্ষেপে যায় লোকগুলো। এ যে বদ্ধজলার শ্যাওলা জমা পানি। সুতরাং তোর মনকে তোর মস্তিষ্ককে দ্বিগুণ শক্রিয় আর সচল রাখতে হবে। নইলে স্রেফ ধ্যাতলা মেরে যাবি।

কালাম কী সেদিন বুঝতে পেরেছিল? বুঝতে পেরেই সাবধানী দিয়েছিল? এই যে কোন কিছু ভালো না গালা, অন্তর মাঝে খুঁজে না পাওয়া পৃথিবীর ডাক– একি সেই মৃত্যুরই পূর্বাভাস যার নাম স্থবিরতা? এই যে কোন কিছুই ভালো লাগেনা আমার, পৃথিবীর ডাকখুঁজে পাইনা অন্তরের গভীরে, আমি নির্বিকার, এ সব কি সেই স্থবিরতারই লক্ষণ? তাই বা কেন হবে? এক নম্বর দুনম্বর বাড়ি নিয়ে এই যে আমাদের কারাগারের সংসার এর কোথাও আমার কোন বিতৃষ্ণা নেই এবং প্রতিটি মানুষকে নিয়ে আমার আগ্রহ, আমার উৎসাহ। আর উদ্বেগ কখন কার উপর কী যন্ত্রণা নেমে আসবে কে জানে। শুধু তাই নয়, বদ্ধকঠির এই সংসারটাকে নিয়ে– যদি এটাকে সংসার বলা চলে– আমি যেন দায়িত্ব ও অনুভব করি। ফকির ভাইর মাথার উপর ভেন্টিলেটেরের মুখে যে ঝুল জমেছিল ওটা আমারই নজরে পড়েছিল। আর সাতদিন ধরে মেটের পেছনে ক্রমাগত ট্যাঁ ট্যাঁ করে লম্বা বাঁশটা অবশেষে আমিই এনেছিলাম, ঝুলটা পরিস্কার করেছিলাম। সেই রাজনীতির পোকা কাসেম দিনরাত মুখে যার কথার খই ফোটে সে যে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে, এটা আমারই নজরে পড়েছিল প্রথম। কেন ওর মন খারাপ? এ প্রশ্নটা বুকের তলায় লুকিয়ে রেখে ওর সীটে বসে গল্প করেছি দিনভর। ওকে চাংগা করে তুলেছি।

এটা কি যথেষ্ট দায়িত্ব বোধের পরিচয় নয়?

দেওয়ালগুলো ধুলো ময়লায় ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। হোয়াইট ওয়াশের জন্য জেলারকে তাগাদা দেয়া দরকার। এ ব্যাপারটাও আমিই স্মরণ করে দিয়েছি কালামকে। মন্টু হাসিব আর ওঘরের আহসান, এদের পড়িয়ে আমার আনন্দ। কোন দিন গাফিলতি করিনি এ দায়িত্বের। তবে কেন আমার মনে হয় চলমান পৃথিবীটাকে হারিয়ে ফেলছি আমি?

উঠে পড়লাম। কালামকে চাই। কালাম ছাড়া আর কেউ বুঝবেনা আমার এই মানসিক দ্বন্দ্ব। কালাম সীটে নেই। বারান্দায় বসে ফালতুদের নিয়ে সভা করছে। কালু, হোসেন, আফাজদ্দী, মদন আলী, নিবারন– ফালতুদের সবাই আছে। আর আছে মেট কলিমুদ্দী, সাফাইয়া সুরেশ। গতকাল মেটকে গালি দিয়েছে আফাজদ্দী, মেটের হুকুম অমান্য করেছে। পরশু রাত্রে রাগ করে খায়নি মদন আলী। রাগ করেছে 'সিক্রুটি' সায়েবদের উপরই। মুরগীর গোশত ছিল সে রাতে, মদন আলীর ভাগে কম পড়েছে। আমাদের সব খাবারেরই ভাগ পায় ওরা। মদন আলীর অভিযোগ, ম্যানেজার হাসিব সাহেব ওকে নাকি ঠিক নজরে দেখেন না। এ সবের ফায়সলা হচ্ছে সভা করে। ওরা বলে বিচার। কালাম 'বিচার' করছে।

এ সব পরে করবি, এখন উঠে আয়। কালামের হাত ধরে টেনে তুললাম। কি হল? গা'টাকে শক্ত করে শুধাল কালাম।

আহা, আয় না? বিরক্ত স্বরেই বললাম। ও উঠে এল। বসলাম ওর সীটে গিয়ে।

আমার ভালো লাগছেনা। কিছুই ভালো লাগছে না।

আমার কথাটা শুনে টেবিল থেকে একটা বই হাতে তুলে নিল কালাম। বইটা আমাকে দিয়ে বলল– নে, এই উপন্যাসটা পড়গে।

না, পড়তেও ভালো লাগছে না।

তবে যা খুব করে গা ডলে গোসল করে আয়।

উঁহু ওতে কিছুই হবে না। আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি, কালাম! কেবলি মনে হয় এই বিশাল পৃথিবী যেখানে জীবনের কর্মশালা, আমার থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে সেই পৃথিবী। কোন দিনই আর নাগাল পাব না তার।

এবার চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ করে আমাকে দেখল কালাম। কী হয়েছে?

খুলে বল।

বললাম তো কী হয়েছে। ভাল লাগে না। মায়ের চিঠি পাইনা দুমাস। কিন্তু সেজন্য এতটুকু উদ্বেগ নেই মনে। ভাই বোনদের চিঠি পাইনা, পাবার আগ্রহ নেই। ওদের কচি কচি দু'খানো মুখ, এতো ভালোবাসতাম সে মুখ। কিন্তু হাজার মাথা কুরেও সে মুখ আমি স্মরণে আনতে পারছিনা। আমার কি হয়েছে কালাম?

বিশেষ চিন্তিত বা বিচলিত হল না কালাম। সংক্ষেপে বলল, হুঁ, তারপর? আর কী কী মনে হয় তোর।

মায়ের আমার দিনরাত্রি বিলাপ, কবে তাঁর হারানিধি ফিরে আসবে তার কোলে। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ মা। কিন্তু সেজন্য আমার যেন কোন দুঃখই নেই। মায়ের কষ্ট আমাকে যেন স্পর্শ করে না। আমি নির্বিকার।

কালাম একটা সিগারেট ধরাল। এক ফুঁক ধোঁয়া ছেড়ে বলল, হুঁ, তারপর?

কালাম! যে রাত্রে সনুমামার মা মারা গেলেন সে রাতটার কথা মনে আছে তোর?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল কালাম, ওর মনে আছে।

রাত আটটা। তখন আমরা বড় বাড়িতে। কম্বল বিছিয়ে লম্বালম্বি দস্তরখান পেতে খেতে বসেছি। এমন সময় লক-আপ খুলে ঘরে এসে ঢুকলেন ডেপুটি জেলার, জমাদার।

কী ব্যাপার, সনুমামার 'অফিস কল'।

আমরা চমকে উঠেছি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লয় পেলেও রাত্রে কখনো জেল খানার লকআপ খোলা হয় না, এমন কড়া আইন। বুকগুলো আমাদের দুরু দুরু কাঁপছে, নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। তুই ডেপুটি জেলেরকে একপাশে নিয়ে কিছুক্ষণ ফুসফাস করলি। তারপর আমাদের কাছে এসে বললি, সনুমামা আট ঘন্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন। বাইরে আই বি পুলিশ এসে অপেক্ষা করছে, এক্ষুনি যেতে হবে সনুমামাকে।

তা হলে সাংঘাতিক মারাত্মক কিছু নয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্য এক আশংকা ছায়া ফেলল সকলের মুখের উপর। সনুমামার মায়ের অবস্থা সংকটজনক। দুদিন আগে বাইরে থেকে অনেক তায় তদবিরের পর কিছুক্ষণের জন্য প্যারোল পেয়েছিলেন সনুমামা। বেলা দশটার সময় গিয়েছিলেন সনুমামা, সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছিলেন। ফিরে এসেই মুমূর্ষু মায়ের অন্তিম মুহূর্তে শয্যাপাশে থাকার জন্য অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আর একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। দুদিন পরে সে আবেদন ফল দিয়েছে হয়ত। কিন্তু তাঁর

মায়ের যে শেষ অবস্থা এতে সন্দেহ রইল না কারু। নইলে এ রাতের বেলায় প্যারোল হতো না, সনুমামা না খেয়েই চলে গেলেন।

খা। আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল কালাম। সিগারেটের আমার অভ্যাস নেই। মাঝে মাঝে সখ করে এক আধটা টানি।

একটু দূরে এসে বসেছে ফালতু হোসেন। আমার কথাগুলো শুনছে ও। আমাদের সম্পর্কে আমাদের সব ব্যাপারে তার অদম্য কৌতূহল। সিগারেটে একটা দম দিয়েই কাশি পেল আমার। সিগারেটটা বাড়িয়ে দিলাম হোসেনের দিকে।

তারপরের কথা মনে আছে তোর? তোরা সব জেগে রইলি। আমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো আমার শেষ রাতে যখন সনুমামার বিলাপে এই পাষাণপুরীর দেয়ালগুলোও গুমিয়ে গুমিয়ে কাঁদছিল। সকলের চোখেই পানি। সনুমামাকে ঘিরে তোরাও কাঁদছিলি। কিন্তু জানিস কালাম? আমি কাঁদতে পারিনে। কতো চেষ্টা করেছি কাঁদতে, কান্না আসেনি। সেদিন, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল আমি কি কাঁদতে ভুলে গেলাম?

ইস্ আর একটা সিগারেট ধরাল কালাম। কেন যে এতো সিগারেট খায় ও?

তুই কি দেখিসনি আমি কাঁধে হাত রেখেছি সনুমামার। পাশে বসেছি, সনুমামার মাথাটা এক সময় তুলে নিয়েছি কোলে। কোলের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলেন সনুমামা। সে দিন সে রাত তার পরদিনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। কিন্তু আমার চোখ দুটো ছিল খটখটে শুকনো। আমি কামনা করছিলাম, প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম অন্ততঃ দুটো ফোঁটা পানি এসে ভিজিয়ে যাক আমার চোখের পাতা। কিন্তু মনের ভেতর আমি কি ভাবছিলাম, জানিস? ভাবছিলাম, কী অর্থ হয় এই কান্নার? কী অর্থ হয় বাতাসে হাহাকার তুলে এমনি শোক প্রকাশের? জীবন যাদের কঠিনের অংগীকার কান্নার দুর্বলতা তাদের শোভা পায়? সত্যি কথা বলতে কি আমার খারাপই লাগছিল। বিশ্রী লাগছিল মেয়েমানুষের মতো সনুমামার ওই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। আর তোদের ছলছল চোখে সহানুভূতির বহর দেখে গাটা আমার কেমন কুঁকড়ে আসছিল। আমার মনে জেগেছিল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন– তোদের ওই সহানুভূতির সবটুকুই কি আন্তরিক? এখন বল কালাম এমন করে ভাবা কি স্বাভাবিক?

বিনা উত্তরে সিগারেট টেনে চলেছে কালাম আর ধোঁয়া গিলছে।

তারপর চোখ দুটাকে এক সময় গাঢ় এবং গভীর করে তাকাল আমার দিকে। আমি বুঝলাম না সে দৃষ্টির অর্থ।

সত্যি কালাম, কান্না আমি ভুলে গেছি। সেই সেদিন নিদারুন খবরটা নিয়ে চিঠি এসেছিল তোর। গম্ভীর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলি তুই। তারপর সবাই শুয়ে পড়ার পর বালিশে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেংগে পড়ছিলি তুই। সেদিনও তো কাঁদতে পারিনি আমি। কেন এমন হল কালাম?

ও কিছু নয়। এতক্ষণ নীরব থাকার পর এই মামুলি সান্ত্বনার কথাটুকু ছাড়া আর কিছু যেন বলার পেল না কালাম। কিছু নয় বলছিস কালাম? তুই কি বুঝতে পারছিসনা কোথায় চলেছি আমি? কান্না ভুলতে ভুলতে এমনি করে একদিন আমি যে হাসতেও ভুলে যাব! দুঃখ শোক যন্ত্রণা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা এ সব মানবীয় অনুভূতিগুলো হারিয়ে আমার কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকবে? আমি পাথরে রূপান্তরিত হব। না না কালাম তেমন অমানুষিক অবস্থার কথাটা ভাবতেই পারি না আমি। আমাকে পথ দেখা।

চল এখন ওবাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি। ওসমানের আজ জন্মদিন। কালাম একরকম টানতেত টানতেই নিয়ে চললো আমায়।

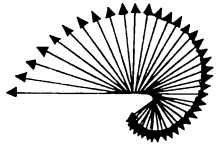

আটই জৈষ্ঠ

কিছুই ভালো-না-লাগার জেরটা এখনো মুছে যায়নি। মেঘ জমেছে আকাশে। নীচে মেঘের ছায়ায় উঠোনে এ বাড়ি ও বাড়ি পায়চারি করি আর মনের ভেতর নাড়াচাড়া করি কালামের কথাগুলো। অনেক দুঃখ অনেক কান্না দেখেছিস তুই, বহু মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিস। অবচেতন মনে তাই কান্নার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ধুমিয়ে উঠেছে তোর। তাই এমন হয়েছে। হৃদয়হীন এই দেয়ালের দেশ থেকে যেদিন মুক্তি পাবি সেদিন দেখবি এ সব ভার অলক্ষ্যেই নেমে গেছে তোর মন থেকে।

অন্তরতম দেশ থেকে উঠে আসে আমার আকুতি, তাই হোক। কালামের কথাটাই সত্য হোক।

প্রিং প্রিকট। শুকসারী আর ওদের বাচ্চারা আজও এসেছে। আজ কিন্তু পাশাপাশি বসে পরস্পরের কাছ থেকে আদর খেলোনা ওরা। বসেছে বেশ কিছুটা দুরত্ব রেখে আর দুজন দুদিকে চেয়ে গান গেয়ে চলেছে যে যার আপন মনে। ওদের একতানে কোথাও যেন পতন ঘটেছে, এক সুরে নয় নিজ নিজ সুরে যেন আলাদা আলাদা গান গাইছে ওরা। হঠাৎ এক নম্বর বাড়ির কানিশ থেকে ঢ্যাংগা গোছের একটা দাঁড় কাক উড়ে এসে বসল ওদের মাঝখানে। ওরা দুজন ভয় পেয়ে প্রিং করে উড়ে গেল দুদিকে।

হাসির একটা হুল্লোড় শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বারান্দার এক কোণে 'তুমি' ক্লাবের মিটিং বসেছে। খলিল, হাসিব, মান্নান 'তুমি' ক্লাবের তিন উৎসাহী সদস্য। কালাম ওদের একমাত্র পৃষ্ঠ পোষক। ইদানিং কাসেমকেও কিছুটা দলে ভিড়িয়েছে। 'তুমি' ক্লাবের একটাই উদ্দেশ্য, ম্যানিফেষ্টোতে ওদের একটি মাত্র দাবী। পৃথিবী না হোক অন্ততঃ এ সংসার থেকে 'আপনি'কে নির্বাসিত করে 'তুমি'র অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ওদের ম্যানিফেষ্টোতে উদ্দেশ্যের সাথে সাথে উদ্দেশ্য হাসেলের কৌশলটাও লেখা রয়েছে। কোন জবরদস্তি নয়, তাড়াহুড়া নয়। সময় নিয়ে আস্তে আস্তে ধৈর্যের সাথে বুঝিয়ে শুনিয়ে সবাইকে দলে আনতে

হবে। এক কথায় ইংরেজি করে ওরা বলে পারসুয়েশান। ওদের স্থির বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতেই সকলে যোগ দেবে ওদের দলে। কেননা ওদের দলটাই যে সুন্দর। সেই সুন্দরটা বোঝাতে গিয়ে খলিল ঢেলে দেয় ব্যক্তিগত আবেদন, আচ্ছা অ-দা, এতো ভলোবাসি আপনাকে, অথচ বাংলা ভাষায় যে একান্ত নিকটের সম্বোধন 'তুমি' সেটা ব্যবহার করি না। কোন অর্থ হয়?

সত্যি অর্থ হয় না, অ-দা হেসে সায় দেন। কিন্তু সায় দিলেও যে সহজ হবে ব্যাপারটা এমন কোন কথা নেই। সবাই অ-দাকে আপনি করেই বলে, সেখানে তিন চার জন বলবে 'তুমি' এমন বেখাপ্পা ব্যাপারটা 'তুমি' ক্লাবের কানেও বিশ্রী হয়েই বাজল।

ফল দাঁড়াল একবার 'তুমি' একবার 'আপনি' এমনি একটি বিভ্রাট বাধিয়ে শেষ পর্যন্ত 'তুমি' ক্লাবকেই পিছু হটতে হয়েছিল।

আমি ওদের দীর্ঘদিনের টারগেট। গেল এক বছরে মান্নান আর হাসিব মিলে কম করে হলেও গোটা চার ডেপুটেশন মেরেছে আমার কাছে। এসব ডেপুটেশনে খলিল কখনো আসেনি। কেন যে আসেনি সেটা আমার কাছে এখনো একটা রহস্যের মতো। আমি জানি ও এসে বললে মতটা আমাকে পালটাতেই হোত।

আমাকে দেখেই বুঝি হাসিবের অকস্মাৎ বিস্মৃত টারগেটের কথাই মনে পড়ে গেল। কিন্তু ওকে আসতে দেখেই আমি উল্টামুখী হয়ে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর সেই একই দৃশ্য– এ মাথা ও মাথা দ্রুত হেঁটে চলেছেন সেলিমভাই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় হাঁটছে না। কি যেন জরুরী কাজে দৌড়াচ্ছেন। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে চলছে কাসেম। এটা কাসেমের দায়িত্বেরই অংগ। অসুস্থ সেলিমাভাইকে সর্বক্ষণ সাথীত্ব দেয়া আর তার ঔষধপত্র পথ্যের দিকে নজর রাখার দায়িত্বটা কাসেমের। গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে চলেছে বেচারা। এমনিতেই একটু ঢিলে ঢালা মোটা ধাচের শরীর কাসেমের। ক্লান্ত হয়ে পড়ে অল্পতেই। তার উপর অত দ্রুত হাঁটতে গিয়ে প্রাণটা তার আইটাই করে। তবু উপায় নেই। কেননা ওটা সকলে মিলে ঠিক করে দেয়া এক গুরু দায়িত্ব। আর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাসেম চিরকালই আমাদের চেয়ে বেশী সজাগ এবং সচেতন।

ওদের পায়ের তোড়ে ভিটির ইঁটগুলোও কাপছে। সেলিমভাই হাঁটছেন আর ডান হাতের তালু দিয়ে ক্রমাগত ঘসে চলেছেন মাথার টাকটা। আর তারই

দেখাদেখি কাসেমও নিজের চুলওয়ালা মাথাটার উপর হাত বুলিয়ে চলেছে। যদি চোখে পড়ে যায় সেলিমভাইর। যদি কোন জিজ্ঞাসা জাগে তার মনে। বুঝি তাই অমন করে সেলিমভাইকে নকল করছে কাসেম।

কিন্তু বৃথা এ চেষ্টা। এজগতের কোন কিছুতেই কৌতহল বা উৎসুক্য নেই সেলিমভাইর। আপর অন্তরের কী এক আগুনে নিঃশব্দ যেন জ্বলে চলেছেন। ওই আগুনের যতটুকু প্রকাশ সে শুধু পায়ের দুটো গোড়ালিতে। বই বন্ধ করে এতক্ষণ ওদেরই দেখছিল মন্টু। এবার চেঁচিয়ে উঠল সবে তো বেলা নয়টা, গোসল করবেন সেই বারটায়, এক্ষুনি মাথায় তেল ঘসতে শুরু করেছেন সেলিমভাই?

থক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেলিমভাই। সাপের চোখের মতো ভয়ংকর দুটো চোখ কী এক জান্তব হিংস্রতায় ধরে রাখলেন মন্টুর উপর।

চমকে উঠলাম। সেলিম ভাইর চোখের ক্ষেত জুড়ে চারাগাছের শিকড়ের মতো সরু সরু অজস্র রক্তাক্ত শিরা। সেই রক্তাক্ত শিরাগুলো ছিড়ে যেন বিষের অনল ঝরছে। এক পা দু পা করে মন্টুর সীটের দিকে এলেন সেলিমভাই। কাছে এসেই ফেটে পড়লেন, কী বললে? আমি তেল মাখছি। ডু আই অয়েল দ্যাট সন অব এ বীচ? নো নেভার। কোন শালার তেল মাখিনে আমি। কোন ব্যাটার তোয়াক্কা করিনে আমি।

চীৎকার শুনে ছুটে এল কালাম। বকে চলল মন্টুকে। এই বুঝি পড়া হচ্ছে তোমার? বই ফেলে ওদিকে নজর দিতে কে বলেছে তোমায়? দিনে দিনে বুদ্ধির ঢেঁকি হয়ে চলেছ। বয়সে তো বাড়ছেনা হাওয়ায় বেড়ে চলেছ।

বেচারা মন্টু। একটা নির্দোষ কৌতুকের পরিণামে এমন মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে ভাবতে পারেনি ও, বেচারার চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম। কিন্তু সৌভাগ্য ওর। সেলিম ভাই ততক্ষণে অদূরে পুষিদের পরিচর্যারত গ-দাকে নিয়ে পড়েছেন। লুক এ্যাট দ্যাট ম্যান। বয়স পঁয়ষাট্টি বছর। এর মাঝে তিরিশ বছর নাকি জেলেই খেটেছে। সেই ইংরেজ আমল থেকে জেল খাটছেন। সো হি থিংকস হি ইজ এ ভ্যালিয়েন্ট প্যাট্রিয়ট। ভাবখানা, এত জেল খেটেছি, আমার দেশপ্রেমে কার সন্দেহ? হঠাৎ থেমে গেলেন সেলিম ভাই। উত্তেজিত পায়ে ঘর কাঁপিয়ে দৌড়ে এলেন। বিঘত খানিক দূরত্ব রেখে মুখোমুখি হলেন গ-দার। বাম হাতটা কোমরে রেখে ডান হাতের তর্জনি দুলিয়ে বললেন, আরে মশায়, শুধু জেল খাটলেই নেতা হওয়া যায় না। বুঝলেন? হি হি হি।

এমনিতেই 'তাল তাওয়া' বিশেষ থাকে না গ-দার। তার উপর সেলিম ভাইর পাগলামিটা ইদানিং ঠিক কোন পর্যায় পৌঁছেছে সে খবরটা বিশেষ রাখেন না। চটেই উঠলেন গ-দা, এই সক্কাল বেলায় কি বক বক করছেন মশায়। যান যান নিজের চরকায় তেল দেন গে।

মুখচোখে রাগ আর বিরক্তি ফুটিয়ে বলা গ-দার কথাগুলো শুনে ঘোর উন্মাদের মতোই হি হি করে আর একবার হাসলেন সেলিম ভাই। বললেন, নেতা বলে মানছিনে, তাই গায়ে খুব ফোসকা পড়ছে, না?

কিন্তু গ-দা লেট আস বি ফ্রাংক, আই কান্ট অয়েল ইউ এ্যানি মোর। দ্যাট ইজ ফাইনাল। অবশ্য নিজের চরকায় তেল আমি দেবই। আর কাকে দেব জানেন?

মুখে উচ্চারণ না করলেও চোখে আঁকা আমাদের জিজ্ঞাসা, কাকে?

ওই ফকিরভাইকে। ফকিরভাই আমাকে একখানা মোটর গাড়ি দেবেন বলেছেন। হি হি হি।

গ-দা যেন সত্যি বিশ্বাস করলেন কথাটা। আশ্চর্য হয়েই শুধালেন গা-ড়ী? হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ী, মোটর গাড়ী। তা হলে বুঝলেন আপনার মতো অবাস্তব স্বাপ্নিক অর্থাৎ অপদার্থ, আপনাকে তেল মেখে কোন ফায়দা নেই আমার। চলুন ও দিকে চলুন, গাড়ী দিয়ে করবেন কী আপনি। সেলিম ভাইর বাজুটা ধরে টানতে টানতে বলল কালাম।

গাড়ী দিয়ে করব কি মানে? চাপা দেবো। এ জন্যেই তো গাড়ী একখানা দরকার হয়ে পড়েছে।

কাকে চাপা দেবেন? আশ্চর্য হয়েই শুধালাম।

দ্যাট ওল্ড ফুল গ-দাকে। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন সেলিমভাই।

থাক। গ-দাকে চাপা দিয়ে কাজ নেই। সেলিমভাইকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল কালাম। বাধা দিচ্ছেন সেলিমভাই, নো নো আই মাষ্ট সেটেল উইথ দিস ওল্ড ইডিয়ট। লীডার সেজেছেন। দেখাচ্ছি লীডারীর মজা।

গ-দা মন্টু সব কটি চোখই চেয়ে থাকে বিষণ্ন অপলক দৃষ্টির বেদনা ঝরিয়ে। সেলিম ভাই কি সত্যি পাগল হয়ে গেলেন?

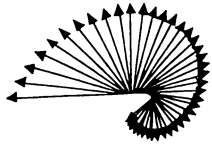

এগারোই জৈষ্ঠ্য

আমি কী? কী সার্থকতা আমার এই মানবজন্মের? আজকের দিনে, এই তারিখে অন্তরের কোন গভীর প্রদেশ আলোড়িত করে এ প্রশ্নটাই যেন উঠে আসে বার বার! এমন প্রশ্ন নিজেকে কি আর কোন দিন শুধিয়েছি? মনে পড়ে না।

শুধু কাব্য লেখনীতে মুখ গুঁজে থাকেনি, সৃষ্টি সমুদ্রে ডুবে থাকেনি যে কবি, স্বদেশ প্রেম যার ছিল জীবনাহুতির শপথ, জীবিত থেকেও কি কালের অতলে বিস্মৃত হয়ে চলেছে সে কবি! ভুলে যাচ্ছি তার কথা?

শুধু আমিই নই, গোটা বাংলা দেশেই যেন হারিয়ে ফেলছে নজরুলকে। ভুলে যাচ্ছে আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন, ঝঞ্ঝার বেগে সে এসেছিল, অগ্নিবীণায় সুর তুলেছিল সৃষ্টি প্রলয়ের, নাম পেয়েছিল বিদ্রোহী কবি। বিদ্রোহ তাঁর সনাতনী আচার নীতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, আপন ধর্ম আপন সমাজের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে, নপুংসক মেরুদণ্ডহীনদের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ তার পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য, বিদ্রোহ তাঁর অগ্নিময় গদ্যে কবিতার নির্ঘোষে শেকল ভাংগার গানে 'লাংগলের' ভাষায় 'ধুমকেতুর' পাতায় পাতায়। বিদ্রোহ তার ফৌজি ছাউনীতে রণাঙ্গনে, মাঠে প্রান্তরে, রাজপথের মিছিলে, ইংরেজ কারাগারে ভুখ হরতালে। সেই বিদ্রোহী কবিকে যেমন গৌরবে, শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসার সম্মানে স্মরণ করা উচিত তেমনি ভাবে স্মরণ করি কী? তাকে কী অনুভব করি নিজের মাঝে, উপলব্ধি করি চৈতন্য সত্ত্বার নিবিড়ে একান্ত প্রিয় কোন ভাবনার মতো! আত্মার দূর অভিযাত্রায় যেখানে আমি দাবি করি মহামানবের বিজয়োৎসবে আমি সামিল, সেখানে একান্ত নির্ভর যোগ্য সাথীর মতো তাকে কি দেখতে পাই? দেখতে চাই কখনও? অথবা আমি যখন ভাবি আমি কী– কোন দার্শনিক মৃত্যুর মুহূর্তে নয় উজ্জীবনের দুর্লভ লগ্নে আমাকে যখন ভাবতে হয় কোন উপাদানে ঢেলে ছেচে আমাকে তৈরী করেছেন বিধাতা তখন কি মনে পড়ে এদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল এ দেশের বাতাসে এখনো বুকভরে নিঃশ্বাস টানে বিদ্রোহী কবি নজরুল? সে কবি নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল আপনাকে। আপন আরাধনা, শক্তি আর ভৈরব প্রাণের যে অসংখ্য বীজকোষ পুষ্পরেণুর মতো

ছড়িয়ে রেখেছিল বিস্তীর্ণ এ দেশের প্রান্তরে তা থেকেই কি উপ্ত নয় আমার এ জীবন? আমার এ জীবন সেই বিদ্রোহ সত্ত্বার সৃষ্টি। এ কথাটা কি জানি? জানতে চাই? এ সত্যকে স্বীকার করে গৌরব পাই? আসলে গৌরব বোধ আসে যে ইতিহাস আর যে ঐতিহ্য চেতনা থেকে, সে ঐতিহ্য সে ইতিহাস তো আমার রক্তে কথা কয়ে ওঠেনা।

কেন? ইতিহাস থেকে বিদ্রোহী কবিকে ছেঁটে ফেলেছি বলে?

যে যুগটা এসেছিল ক্ষ্যাপা বাতাসে ভর করে প্রাত্যাহিক যত দৈন্য তুচ্ছতা যত জঞ্জাল উড়িয়ে নেয়ার প্রতিজ্ঞা লয়ে সে যুগের চারণ কবি নজরুল। দূরের নয় সে যুগ। তবু সে যুগের প্রতিধ্বনি বাজে না আজ অন্তরে অন্তরে। একি কারণ কবি মাত্রেরই ব্যর্থতা? যুগ চলে গেল। সংগ্রাম গেল থেমে। থাকল না তাঁর কবিতার দাম, তার গানের মূল্য আর অগ্নিময়ী ভাষার আবেদন। চারণ কবিদের ভাগ্যে এই নির্মম পরিহাস হয়ত নতুন নয়।

কিন্তু চারণ কবির কপালের এই নির্মম লেখনটা নজরুলকে শুনিয়ে দিয়ে আমি কি দায় মুক্ত হতে চাইছি, খোঁচা-খাওয়া বিবেকটাকে একটু শান্ত করতে চাইছি। হয়ত তাই। ইতিহাস যার ধমনীতে কথা কয়ে উঠেনা এমনি করেই নিজকে ফাঁকি দিয়ে চলতে হয় তাকে।

কিন্তু চারণ কবিকে বিস্মৃতির ওপারে ঠেলে দিয়ে আমার পায়ের তলায় মাটি থাকে কোথায়? আমি তো দাঁড়াবার ঠাঁই পাই না, এই বিশাল পৃথিবীর বিচিত্র মানবগোষ্ঠিকে যে ঠাঁইটুকু দেখিয়ে বলতে পারি, এই ক্ষুদ্র যায়গাটুকু এর যত ফল-ফুল-লতা-পাতা সৃষ্টি সম্ভার সবই আমার, একান্ত ভাবেই আমার। এর প্রতি সৃষ্টির অণুতে অণুতে আমারই জীবনের স্পন্দন। এর নদ নদী স্রোতধারায় আমারই জীবনের প্রবাহ।

মাটি নেই পায়ের তলায় অথবা ছিল– সরে গেছে। সরে যাচ্ছে– এ এক মর্মান্তিক উপলব্ধি আমার কাছে। এ উপলব্ধি, এ বোধটুকুর অনেক দাম আমার কাছে। এ উপলব্ধি আমাকে ঘর ছাড়া করেছে, আমি খুঁজতে বেরিয়েছি আমার ভিতরে, আমার মাটিকে। সে মাটির গভীরে আমার শিকড়কে। এই শিকড় খুঁজতে খুঁজতে আমাকে পুনর্বার আবিষ্কার করতে হয় নজরুলকে। কেননা নজরুলকে অনুসরণ করেই তো আমার অস্তিত্বের শিকড় মাটি পেয়েছিল।

আর সেই বীজকোষ, বিদ্রোহী প্রতিভা পরাগের মতো অজস্র ছিটিয়ে রেখেছিল এদেশের পলি মাটির উর্বরতায়, সেই বীজকোষে আমার আজিকার এই রক্ত মাংস দেহের ওই প্রথম রূপটি যেন প্রত্যক্ষ করি। আমি আশ্চর্য হই। আমি

আবিষ্কার করি। তখন আমাকে খতিয়ে ভাবতে হয়– আমারই পূর্ণ আর প্রসারিত দৃষ্টির সুমুখে আপনাকে তুলে ধরতে হয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, বিচার করতে হয়।

অসহ্য যন্ত্রণা এই আত্মদর্শন, এই আত্মবিচারে। তেমনি লজ্জা। গাভীর এক লজ্জা। আর ধিক্কার। তবু এই যন্ত্রণাময় অনুভূতি, এই ধিক্কার বোধ আমাকে পাথ দেখায়। আমি খুঁজে পাই, আমার মাটি আর সেই প্রশ্নটির জবাব। আমি কী! আমি সেই কবিসত্ত্বারই একটি অংশ সেই বিদ্রোহী প্রাণেরই ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ। এ জন্য আমার ও অমরত্বের দাবী, দুর্জয় আবেগে কঠিনের আলিংগন।

আশ্চর্য হই। যে কবির ছিল "একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য্য", যে কবির দৃপ্ত ঘোষণা– 'সত্য স্বয়ং প্রকাশ তাহাকে কোন রক্ত আখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না-------আমি পরম আত্মবিশ্বাসী', সে কবিকে আজ আবিষ্কার করতে হয়? সেই যে ঘোর দুর্দিনে চীৎকার করে সবাইকে ডেকে ছিল "বল বীর চির উন্নত মম শির"। এ ডাক যারা শুনেছিল তারা তো অনেকেই লুপ্ত। অনেকেরই শোনা হয়নি সে ডাক। আজও কি শোনা হবে না? বাঁধন ছাড়া হীরের টুকরো প্রাণ। ওরা বন্দী। নজরুল জয়ন্তী পালন করল ওরা। বিদ্রোহী প্রতিভার আবির্ভাবকে যে বাণী দিয়ে আর্শীবাদ করেছিল কবি-সম্রাট সে বাণী স্মরণ করে শেষ হল অনুষ্ঠান।

"দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন!"

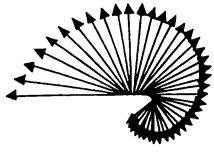

আঠারোই শ্রাবণ

কলম আর খাতা নিয়ে বসেছি। অনেকদিন লেখা হয়না কিছু। কিন্তু চোখটা রয়েছে গ-দার দিকে।

গ-দার তিন পুষ্যি। দুলি আর তার দুই সন্তান, টেলকু বেলকু। দুলি বসেছে গ-দার কোলে। টেলকু বেলকু বসেছে দুই হাঁটুতে। একটু আগেই দুধ খেয়েছে ওরা। এখন জিবের লালা টেনে হাত মুখ প্রক্ষালন করছে। স্নেহ ভরা চোখে তাই দেখছেন গ-দা আর হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ওদের পিঠে। প্রক্ষালন থামিয়ে মাঝে মাঝে সে আদরের সাড়া দিচ্ছে ওরা– এ্যাঁও।

সেলিমভাই পায়চারি করছেন, তবে আগের মতো ঘর কাঁপিয়ে নয়, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক পায়ে। একটু নাকি ভালো আছেন। তাই পেথিডিন দেয়া বন্ধ করেছেন ডাক্তার।

প্রাচীরের আড়ালে সুর্যটা ঢাকা। দৃষ্টি আর মনটাকে হ্যাঁচড়ে টেনে এক করলাম। একাগ্র হলাম। কলম ছেড়ে দিলাম খাতার পৃষ্ঠায় ঃ

ওগো মেয়ে! তোমাকেই খুঁজি!
আকাশ তোরণে
যেখানে সূর্য্য-প্রদীপ
সেখানে,
প্রদীপের ছায়ায় ছম ছম ভয়ে
সেখানেও।
আর এখানে
এই রুদ্ধ গারদে
অন্ধ প্রকোষ্ঠে,
ভ্রুকুটির দেয়ালে দেয়ালে।

একটু হেসে আবার গেয়ে চলল। এই হাসিটুকুর অর্থ, গোল করনা আমাকে গাইতে দাও।

দুঃসাহসী বীর, কোন বাধাই গ্রাহ্য নয় তার। দুর্গম গিরি কান্তার মরুর আকাবাঁকা উঁচুনীচ পথ ভেংগে বীর চলে। তেমনি চলে কাসেমের গান। সুর থাকে না তাল থাকে না, সে সবের প্রয়োজন পড়েনা। গাওয়াটাই বড় কথা। ওর সংগীতের এই বেপরোয়া গতি অনেকেরই স্নায়ুতে এবং শ্রবণে পীড়ন দেয়। ওরা হয়ত প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু তার আগেই হেসে দেয় কাসেম। সে হাসির কথা স্পষ্ট– আহা অমন করছ কেন? আমাকে গাইতে দাও। কারো আর কিছু বলা হয়না। কাসেম গেয়ে চলে।

আসছনা কেন এদিকে? বুঝি ঘুর ঘুর করছি দেখেই ডাকল কালাম। একখানা চেয়ার টেনে বসলাম ওর সীটের পাশে।

কিছু বলবে ভেবেছিলাম,কিন্তু কিছু বলল না ও। মেঘদূতের পাতার উপর বারেক চোখ বুলিয়ে আবার চেয়ে থাকে মেঘেছাওয়া আকাশটার দিকে। সেই উদাস দৃষ্টিটা এখন সরে গেছে ওর চোখ ছেড়ে। ওর চোখ জুড়ে এখন আষাঢ় আকাশের বিষণ্ন স্তব্ধতা। আমার মনে হল মিরুদ্ধ এক অশ্রুর ঢল ওর শাসন অমান্য করে ওর চোখ ঠেলে এখুনি বুঝি সয়লাব ডাকবে।

চমকে উঠলাম। যদিও চমকে উঠার কথা নয়।

আর ধৈর্য দিয়ে আড়াল করলেও ক্ষত ওর শুকায়নি। এখনোও বুকের ভেতর যে দুঃখটা লুকিয়ে রেখেছে ও, যে দুঃখটা চেপে রাখতে গিয়ে তুষের আগুনের মতো নিঃশব্দে জ্বলে চলেছে অহোরাত্র, নিরালা মুহূর্তে সে দুঃখটাই বুঝি কান্নার সমুদ্র হয়ে ঘিরে ধরতে চায় ওকে। ও তখন অসহায় শিশুর মতো দুর্বল। বুঝি এ জন্যই কাজ থেকে ছুটি নিতে চায় না কালাম। সারাক্ষণ কাজের ভেতর ডুবে থেকে দুঃখটাকে ভুলে থাকতে চায়। স্থির ধীর শান্ত কর্তব্যে অক্লান্ত এই তো কালামের পরিচয়। এ পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে রইল যে অন্তত বেদনা সে খবর কেউ কি জানল? জানল না। কোনদিনই বুঝি জানবে না।

শুধালাম অমন মন খারাপ করে আছিস কেন? বাড়ীর কোন চিঠি পেয়েছিস? ঘাড় নেড়ে জানাল কালাম, পায়নি।

হিমা। হিমার খবর কি? আবারও শুধালাম।

হিমা অর্থাৎ রহিমা, কালামের বন্ধু, বাগদত্তা। কিন্তু হিমার নামটা শুনে না একটু চমকাল কালাম, না একটু নড়েচেড়ে বসল। যেমন চেয়ে ছিল বাইরের দিকে তেমনি চেয়ে রইল।

নিজের দুঃখটা নিয়ে একান্ত নিরালায় আপন মনে একটু নাড়াচাড়া করা, এও বুঝি বিরাট এক সান্ত্বনা। সেই সান্ত্বনাটাও কচিৎ পেয়ে থাকে কালাম। তাই ওর নীরব ভাবনায় অংশীদার হয়েই বসে রইলাম চুপচাপ। দূরে মেঘের রাজ্য। মেঘেরা ছুটে চলেছে অবিশ্রাম। ওদের মিছিলের শেষ নেই। এক ধ্যানে তাকিয়ে রয়েছে কালাম। মুখটা না ঘুরিয়েই বলল হঠাৎ, কালিদাস কি বলেছে। জানিস?

কী?

বলেছে দুঃখী জনের তো কথাই নেই, আকাশের ওই মেঘ সুখীজনের মনেও দুঃখের খোঁচা জাগায়। ম্লান একটু হাসল কালাম। বুঝি মেঘের খোঁচায় জেগে ওঠা ভেতরের দুঃখটাকেই ঢাকতে চাইল।

মৃদু হিল্লোলে বাতাস বইছিল। আকস্মাৎ রুদ্ধ হল বাতাস। আর সেই সাথে স্তব্ধ হল মেঘের মিছিল। মেঘেরা থমকে দাঁড়িয়েছে। 'মেঘদূতটা বন্ধ করে রাখল কালাম। গরাদের ফাঁক দিয়ে দুহাত বের করে গোটা গরাদটাকেই জড়িয়ে নিল হাতের বেড়ে। চেঁচিয়ে উঠল দেখ, দেখ, হামেদ। ওর চোখ অনুসরণ করে দেখলাম, পুঞ্জ পুঞ্জ থমকে থাকা দিশেহারা মেঘ।

তোর কি মনে হয়না হামেদ, ওই মেঘপুঞ্জ তোর আমার সকলের চোখের অবরুদ্ধ অশ্রু।

হ্যাঁ তাই। বললাম, এই আষাঢ় আকাশ বন্দী হিয়ার রোদন।

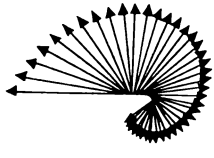

ভেইশে শ্রাবণ

আনন্দময় আনন্দ লেপা একখানি মুখ সেলিমভাইর। যেন পবিত্র কোন আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি। বাইরে কাজের ফাঁকে আর এই কারাগারে– এবার নয়– এর আগের বার, কতোদিন এ মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকেছি। আপনার মাঝে অনুভব করেছি এর আনন্দটুকু।

সে মুখ আনন্দ হারিয়েছে, সে মুখে আজ সন্দেহ ক্রোধ অবিশ্বাসের কুটিল ছায়া। সে মুখে বিকৃতি।

কেন এমন হয়? কেন এমন হল? আমারই মনের ভেতর পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসে প্রশ্নটা। আমি কোন জবাব পাই না। আর এই জবাব না পাওয়া, যাকে স্পষ্ট করে ধরতে চাই, তার হদিস না পাওয়া মানুষের জীবনে এর চেয়ে যন্ত্রণাকর কোন অভিজ্ঞতা জানা নেই আমার। কেন এমন হলো?

আসল কথা কি জানিস? এই যে ঘরছাড়া মানুষগুলো– এরা অসাধারণ। কিন্তু জীবনের একটি ক্ষেত্রে এদের বিরাট শূন্যতা–

কিসের শুন্যতা? কালামকে কথাটা শেষে না করতে দিয়েই শুধালাম। গৃহের ছায়া গৃহের মায়া গৃহের যত দুঃখ অভাব অনটন, এ নিয়ে গৃহের যে স্বাভাবিক জীবন তা থেকে আমরা বঞ্চিত। তাই আমরা স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম, আমরা অস্বাভাবিক। অর্থাৎ যাকে বলি জীবনের ছন্দ, সহজাত জীবনধর্ম, সেখানে আমাদের শূন্যতা।

অতো প্যাঁচাচ্ছিস কেন? সিদা কথা, আমরা নই আত্মমুখী, আমরা নই ঘরমুখী। কিন্তু এজবীন তো আমরা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। মহতের পায়ে, আদর্শের পথে ক্ষুদ্রকে বিসর্জন দিয়েছি।

কিন্তু এটা অস্বাভাবিক।

বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। কী অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলে চেচাচ্ছিল। দশজন কাপুরুষের মাঝে একজন বীর– কোনটা অস্বাভাবিক, কাপুরুষতা, না বীরত্ব?

পঁচিশে শ্রাবণ

সেই তর্কটা আবার উঠল।

আমি বললাম কেন এমন হবে? ত্যাগ তো আমার আনন্দ। ত্যাগের ভেতর দিয়েই আমার সংগ্রাম পরম প্রাপ্তির। এ-ই তো আমার বিশ্বাস। অটল এই বিশ্বাসের মাঝেও কি রয়েছে এমন কোন ছিদ্রপথ, যে পথ দিয়ে শূন্যতার অনুপ্রবেশ?

তর্কে আলোচনায় চিরকালই শান্তধীর কালাম। শান্ত দুটি চোখে আমার সারা অঙ্গ যেন বারেক জরীপ করে গেল ও। বলল, প্রশ্ন তোমার দুটো। প্রথমতঃ, কেন এমন হবে? দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বাসেও কোন ছিদ্রপথ রয়েছে কিনা। দুটো প্রশ্নেরই কিন্তু জবাব হয়ে গেছে।

আমি সন্তুষ্ট নই তাতে। গোঁয়ারের মতোই বললাম।

বেশ আমি কয়েকটা প্রশ্ন করছি। যা ভাবছিল ঠিক ঠিক তাই বলবি। হ্যাঁ ঠিক ঠিকই বলবো, জিজ্ঞেস কর।

জীবন কোন সরল রেখা নয়, জীবন বলতে কয়েকটা ছক বা ছকের সমষ্টিও বোঝায় না। এটা মানিস?

মানি।

মুখে বলছিস মানি। আমিও তাই বলি। কিন্তু অন্তর বলে যে পদার্থটি লুকিয়ে আছে ভেতরে সেখানে একবার তাকিয়ে দেখতো? কি দেখছিস? দেখছিস আপন জীবনটা নিয়ে বহু রকমের ছক এঁকে রেখেছিস সেখানে।

উঁহু, আমি স্পষ্ট দেখছি ওগুলো ছক নয়। ওটা হল আউটলাইন মানে কাঠামো। নিজের জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা কল্পিত কাঠামো সব মানুষেরই থাকে। আমারও আছে। বললাম।

আপাততঃ থাক তোর কাঠামোর কথা। সেলিমভাই কিন্তু ছক এঁকেছিলেন আপন হৃদয় পটে তারুণ্যের স্বপ্ন দিয়ে যত্ন দিয়ে সুন্দর করে আঁকা ছবির মতো। যদ্দিন বড় রকমের কোন সংঘাত আসেনি তদ্দিন চলছিল।

যখন দেখি, কেঁপে কেঁপে যায়
দূর কোন মশালের ছায়া
তারা-ঝিলিকের মতন,
তখন মনে হয় তুমি এখানেই।

মনে হয়
তুমি এখানেই,
গারদের গবাক্ষে
তুমি এক ছবি অনন্ত আকাশের।

শূন্য এই প্রাঙ্গনের প্রাচুর্যে
আর রিক্ততার ঐশ্বর্যে
জীবন এক অনন্য প্রত্যাখ্যান,
কেননা জীবন তো শুধু
তোমারই অঙ্গীকার।
ওগো মেয়ে। তাই তো তোমাকে খুঁজি।

কলমটা থেমে গেল। কাঁধের উপর কার যেন হাতের স্পর্শ।

মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, সেলিমভাই। আমার কাঁধে হাতের ভার রেখে এক ধ্যানে চেয়ে রয়েছেন আমারই লেখা পাতাটার দিকে।

লিখছেন? বেশ বেশ লিখুন, অজস্র লিখুন। রুদ্ধ কারার যত বেদনা শাশ্বত সৃষ্টির আনন্দ হয়ে ঝরে পড় ক, আসুক সৃজনের বন্যা। আসুক ফিরে চলতে উদ্যত হয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন সেলিমভাই। শুধালেন, কিন্তু লিখছেন কী?

অক্ষম হাতে দুর্বল ছন্দে –

না না আমি ওসব জানতে চাইছি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি, বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা লিখছেন না তো?

বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম সেলিম ভাইর মুখের দিকে।

ট্রুথ, নাথিং বাট ট্রুথ। দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ স্যাল রাইট। মিথ্যা রংয়ের প্রলেপ নয়, অতিরঞ্জন নয়, ত্যাগ মহিমার ফোলানো ফাঁপানো চরিত্র নয়। সত্য– রুক্ষ ভোঁতা নির্মম কিন্তু সত্য– তা আপনাকে লিখতে হবে। ঠিক তো?

যেন এক্ষুনি প্রতিশ্রুতি চাইছেন আর আমার মাঝের মিথ্যেটুকু ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন, তেমনি ভাবে প্রবল দুটো ঝাঁকুনি তুললেন আমার কাঁধে। বেঁচিয়ে চললেন, ঠিক তো? ঠিক তো?

কিন্তু অপেক্ষা করলেন না আমার উত্তরের জন্যে। জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেলেন। এক চক্কর ঘুরে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। গ-দাকে দেখিয়ে শুধালেন, এই ভদ্রলোকের কথা নিশ্চয়ই লিখছেন?

ঘাড় কাত করে জানালাম, হ্যাঁ।

কিন্তু খবরদার! যেটুকু সত্য শুধু তাই লিখবেন। তিনি বীর, তিনি সব্যসাচী– খাঁটি কথা। স্বরাজ-অসহযোগ স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি নির্ভীক সেনানী, জনপ্রিয় কৃষক নেতা– মানি এসব সত্য। কিন্তু এখন? এখন তিনি কী? একটি ফসিল, একটি কংকাল, কং-কা-ল। ডু ইউ রিয়েলাইজ ইট, আপনি কি এটা বোঝেন?

যেন আমি তার সিদ্ধান্তে সন্দেহ পোষন করছি, তাই রক্ত চোখের শাণিত দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিঁধে রাখলেন সেলিমভাই। বললেন আবার, দেখছেন না, সারাদিন শুধু তাস আর বিড়াল নিয়ে পড়ে থাকেন? একটু চিন্তা করে? একটা বই পড়ে? তা হলে কি পাচ্ছেন আপনি? পাচ্ছেন। একটি চমকে ওঠার মতন সত্য– আঠার বছরের যে তরুণ দেশের ডাকে ঘর ছেড়েছিল, পয়শটি বছরে তার একমাত্র সান্ত্বনা তাস আর তিনটি বিড়াল। হোয়াট এন আইরনী, জীবনের কি নির্মম পরিহাস। হা-হা হা। গ-দা! আপনি রাগ করতে পারেন কিন্তু যা সত্য সে তো আমাকে বলতেই হবে। গ-দা জীবনকে কখনো ফাঁকি দেয়া যায়না। জীবন কি নির্মম প্রতিশোধ নিল আপনার উপর, ডোন্ট ইউ সি? আপনি কি দেখছেন না? হা-হা-হা। তাহলে হামেদ সায়েব এ সত্য ঠাঁই পাচ্ছে আপনার পুস্তকে। আপনি লুকোবেন না? বলুন।

গ-দার দিকে তাকিয়ে দেখি যে কেন পোঁচ পোঁচ কালি লেপে দিয়েছে তার মুখে। তার পক্ষ নিয়েই বললাম, বিড়ালগুলোর কথা বলছেন সেলিমভাই? ওদের তো ভালোবাসেন গ-দা। এত দুঃখ লাঞ্ছনা, জীবনের কৃচ্ছকঠোরতার পর এই যে ভালোবাসতে পারা– এটা কি তাঁর হৃদয়-বৃত্তির পরিচয় নয়?

কি বললেন? হৃদয়? অন্তঃকরণ? ডু ইউ নো, আপনি জানেন? এ লোকটা এই জেল থেকে গেল চার বছরে একখানা চিঠি লেখেনি কোথাও? একখানা চিঠি পায়নি কারুর কাছ থেকে? জিজ্ঞেস করুন তাকে! জিজ্ঞেস করুন তাকে, তিন

কুলে কেউ আছে তার? একটা বন্ধু, একজন শুভাকাঙ্খী ? আপনি বিশ্বাস করেন, এমন লোকের মাঝে হৃদয় বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে? হার্টলেস ক্রুয়েল, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর এ লোক। আপনি জানেন দিস ম্যান হ্যাজ মারডারড্ মি, আমাকে হত্যা করেছে এ লোক?

বলতে বলতে ক্রুদ্ধ আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন সেলিমভাই। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। গৌর গণ্ডে রক্ত উঠে কী ভয়ংকর হয়েছে তার মুখের চেহারাটা। ফুটন্ত জলে লাল গোল্লার মতো টগবগ করছে চোখ জোড়া। মণি দুটো এখনি বুঝি ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

আঁৎকে উঠলাম সে চোখের দিকে তাকিয়ে।

গ-দা! আমি বলছি– গেট ইওরসেল্ফ রেডি। তৈরী হোন। মোমেন্ট অব ট্রুথ, আপনার আমার জীবনে পরম সত্যের লগ্ন আজ সমুপস্থিত। তৈরী হোন, চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য। আমি রেডি গ-দা, আপনি তৈরী?

সেলিমভাই মুঠো করে নিয়েছেন হাতদুটো। মুঠো দুটো চেপে চেপে ফুলিয়ে তুলেছেন লোমশ হাতের মোটা মোটা শিরাগুলো। টান খেয়ে বেতের মতো ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছে সেলিমভাই। আমার মনে হল ভয়ংকর, ভয়ংকর এক হিংস্রতা রক্ত-খেলা ওই গৌর মুখে। দৃঢ় মুষ্টি সেলিমভাই দৌড়ে গেলেন গ-দার দিকে।

এর পর কি হবে, সে আমি ভাবতে পারি না। আতংকে ত্রাসে লজ্জায় চোখ বুজলাম। কিন্তু রক্ষা। কাসেম এসে তাতক্ষণে সেলিমভাইর কোমরটা জড়িয়ে ধরেছে। বাথরুমে গেছিল ও। সে জন্যই এতক্ষণ দেরী হল ওর আসতে। কোমর জড়িয়ে সেলিমভাইকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কাসেম।

সেলিম ভাই ও ঘরে অদৃশ্য হতেই লাফিয়ে উঠলো কবি, কি গ-দা? সেলিমভাই কী বলে।

আরে রাখ রাখ। ক-তো-দে-খ-লাম। পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না খায়। গ-দার ডাকসাইটে গলাটা গম গম করে ওঠে ঘরময়।

জোরে জোরে চিল্লালেই আমাদের মুখ বন্ধ হবে, তাই ভেবেছেন নাকি? বেশ আপনি প্রমাণ করুন আপনার হৃদয় আছে? যা সত্য তাই প্রমাণ্য– দর্শন শাসেত্রর এই নীতিতে তো অটল বিশ্বাস আপনার?

আহত হয়েছেন গ-দা, ক্ষুন্ন হয়েছেন। কিছুটা রেগেছেন ও। এমন সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বুঝি এই প্রথম। সেলিমভাই সুমুখে নেই, হয়তো তাই ভেতরের রাগটা আর সংযমের রাশ মানছেনা। ঠোঁট

দুটো এখনো চেপে রেখেছেন গদা। কিন্তু বিপুল শরীর খানি দুলিয়ে কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে ফোঁ-স ফোঁস্‌স। ধৈর্য ধারনের জন্যই ঘন ঘন তাস সফল করছেন গ-দা।

কিন্তু গ-দার কষ্ট আরোপিত সংযমের ঢাকনিটা না খুলে বুঝি ছাড়বেনা কবি। ভেতরে কি আছে দেখতে চায় ও। সরু চিনচিনে গলাটাকে হুইসেলের মতো তীক্ষ্ণ করে বলল ও, মুখটাকে গম্ভীর করলে নেতার পোজটা নেয়া যায় ঠিকই, কিন্তু হৃদয় আছে সেটা প্রমাণ করা যায় না, বুঝলেন?

নিরুত্তর তাস সাফল্‌ করে চলেন গ-দা। 'ধৈর্য' খেলা খেলবেন।

"জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর", গ-দাকে আর একটু চটাবার জন্যই হঠাৎ আবৃত্তি করে ওঠে মন্টু।

তবু রা নেই গ-দার। 'ধৈর্য' খেলার তাসগুলো এক এক করে বিছিয়ে চলেছেন।

কবি আবারও টিপ্পুনি ছাড়ল, সারা জীবন তো গদা ঘুরিয়েছেন, মাসল ফুলিয়েছেন, তা নইলে বুঝতেন হৃদয় আছে– বিড়াল প্রেমে শুধু এ কথাটাই বোঝায়না, অন্য কিছুও বোঝাতে পারে! কী, মাতবোল নেই যে।

এবার খেঁকিয়ে উঠলেন গ-দা, আরে যা যা, বাজে বকিসনে। এই বুড়োহাবড়া হাতের উপর দিয়ে তোদের মতো কত চ্যাংড়া এলো আর গেল। হুঁ।

অনেকদিন পর লিখতে বসেছিলাম। লেখা হলনা। খাতাটা বন্ধ করে উঠে পড়লাম।

বাইরে শ্রাবণ আকাশে মেঘে মেঘে ডম্বরু ডাক।

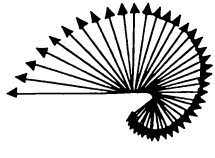

সাতাশে আশ্বিন

এই কারাগারেও শরৎ এসেছে।

রুদ্ধ কুঠির বদ্ধ অংগনে আজ খলখলিয়ে বেড়ায় সোনারোদ, গরাদ ভেংগে আছড়ে পড়ে সিমেন্টের মেঝেতে। শেফালীরা বিছিয়ে রেখেছে শাদা চার। সকাল বেলার শেফালী তলার ওই শুভ্রতার উপর চোখ রেখে আকাশের সূর্যটাও বুঝি ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে।

বাগানে এসেছে একটি হলুদ পাখী। প্রতি বছরই এমন দিনে কোত্থেকে যেন উড়ে আসে ও। শরৎ হেমন্ত এবং শীতকালটাও এখানেই কাটিয়ে যায়। তারপর যেমন আচম্বিতে এসেছিল তেমনি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়।

রশিদের ঝাড়গুলোতে গোলাপ ফুটেছে অজস্র। কোন শিল্পীর হাত যেন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে স্তবকে স্তবকে সাজিয়ে গেছে ফুলগুলো। আর বাগানের মধ্যিখানটায় মরশুমি রংয়ের বাহার, গুচ্ছ গুচ্ছ সুইটপী।

কেমন লেপামোছা তকতকে আজকের আকাশটা। মনে হয় যেন নীলে ধোয়া শ্বেতবস্ত্র, পরিপাটি মেলে ধরা।

শিউলী ঝরা সকাল। সোনা রোদের সোহাগী ধারা। বাগানে হলুদ পাখীর চঞ্চল নৃত্য। শালিকের গান। ফুলে ফুলে প্রজাপতির আনন্দিত বিচরণ। গোলাপ আমোদিত বাতাস। আর মাথার উপর সেই আকাশ-দৃষ্টি, বুঝি নীলচোখ প্রেয়সীর কোমল চাহনী। সব মিলিয়ে অনিন্দ্য রমনীয় পরিবেশ।

বাতাস বইছে ঝির ঝির। সে বাতাসে লহর খেলে গেল তরল রোদ। হঠাৎ নমে আসা বরফবারির মতো ঝরে পড়লো একরাশ শেফালী। মাটির মরশুমি গন্ধে ভরে গেলো বন্দীর অংগন।

অদ্ভুত কথা মনে হয় আমার। মনে হয় কোথাও বুঝি চলেছে জীবনের অভিষেক, চলেছে কোন আনন্দব রণের মহামেলা। এ সব যেন তারই আয়োজন। চারিদিকে তারই আমন্ত্রণ।

অস্বাভাবিক মানেই মন্দ, আমি কি এমন কিছু বললাম? আমি বলছি লাইফ ইন ফুলনেস, লাইফ ইন টোটালিটি, জীবন বলতে যে সম্পূর্ণতা তার আস্বাদ

আমরা পাইনি। পরিপূর্ণ জীবনেরপরিচয় জানা নেই আমাদের। এই যে অসম্পূর্ণতার ফাঁক জীবনে, তুই কি ভাবছিস, এর দাম দিতে হবে না? প্রতিদিন তুই আমি সেলিমভাই স-ক-লে, এই শূন্যতার নিদারুন মূল্য দিয়ে চলেছি।

আবার গুলিয়ে ফেলছিস তুই। বলি, জীবন দিয়ে জীবনের মূল্য দান এ কী কোন নতুন কথা তোর কাছে? যেদিন তুই প্রতিশ্রুত হলি তোর বিবেকের কাছে সেদিন থেকেই তো জেনে নিয়েছিস তুই, ত্যাগ তোর জীবন, কর্ম তোর ধর্ম, ভোগ তোর নিষিদ্ধ। কর্মে আর ত্যাগেই তোর জীবনের সার্থকতা। কাজেই অপূর্ণতার কথা ওঠে কেন?

ওঠে এই জন্য, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য তা সবসময় হৃদয়গ্রাহ্য নয়। বুদ্ধি দিয়ে সাধারণ পথের চাইতে আলাদা নিজস্ব একটা পথ কেটে নিয়েছি আমি। কিন্তু সে পথে চলতে গিয়ে দেখি আমার হৃদয়– সাধারণ পরিবেশেই যার লালন সেই হৃদয়ের অনেকখানি যেন ফাঁকা আর শূন্য। সে-হৃদয় বিভক্ত। সেখানে অতৃপ্তি। যখন মিশে থাকি জনতার কোলাহলে তখন চোখে পড়ে না এই শূন্যতা। অথবা চোখে পড়লেও তেমন তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করি না তার খোঁচাটা। কিন্তু এই রুদ্ধ কারাগারে বাতাস যেখানে গুমরে মরে, জীবন যেখানে বদ্ধ-কুয়ার কলুষিত পানির মতো স্থির সেখানে এলেই শূন্যতার এই ফাকটি শুধু ধরা পড়ে না, শুধু খোঁচা জাগায় না প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়ে যায় তোমার সমগ্র অস্তিত্বে–

আজ তোর কি হল কালাম? ওর অসম্পূর্ণ কথার মাঝেই চেঁচিয়ে উঠলাম। সহজ জিনিসটাকে এমন দুরূহ করে তুলছিস কেন? যে বিভক্ত হৃদয় যে খণ্ডিত আত্মার কথা বলছিস তুই, এ কি নতুন কিছু? পুরুষ পরম্পরায় দুশো বছরের যে পরাধীন অভিশপ্ত জীবন, আমি তো তারই ধিক্কৃত সন্তান। আত্মায় চেতনায় আমার যে খণ্ডিত প্রকাশ, আপনার মাঝেই আমি যে দ্বিধাবিভক্ত– এতো উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃঋণের মতোই আমার পাওনা। আর এর বিরুদ্ধেই তো আমার সংগ্রাম। এই অর্থে আমি এক সচেতন সত্ত্বা। কাজেই তুই যে বলছিস অপূর্ণতার হাহাকার, শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস– এ সবের অবকাশ কোথায় আমার জীবনে?

চুপকরে রইল কালাম। কী যেন ভাবছে। ওকে নীরব দেখে বললাম, আমার কিন্তু মনে হয় অন্যকিছু। আমার মনে হয় চারিত্রিক গঠনে এখনো আমরা ভীষণভাবে অপরিপক্ক, ইম্যাচুর। তাই যখন সংকট আসে ভারসাম্য রাখতে পারিনা। এই ইমোশন্যাল ইম্‌ব্যালান্স, এটাই সেলিম ভাইর ব্যাধি।

একসাক্টলী। কিন্তু সংকটটা কিসের? সংকট কি শুধু তোর আমার জীবনে? সংকট তো সমগ্র দেশ জুড়ে। আর এটা হলো একটা সাধারণ সত্য। তুই এই সাধারণ সত্যটা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হচ্ছিস, আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে, এই যে শূন্যতা আমার মাঝে, এই যে অহর্নিশ শূন্যতার পীড়ন এটাই সংকট।

হঠাৎ থেমে গিয়ে চোখ দুটোকে আমার মুখের উপর স্থির ধরে রাখল কালাম। যেন জানতে চাইল বুঝছি কিনা ওর কথা। বললাম, অনুধাবন করছি বলে যাও।

এই যে এখানে যারা বন্দী, সারা দেশ বলছে ওরা দেশের দুলাল, ওরা ফ্লাওয়ার্স অব দা নেশান, জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান। কিন্তু বলতো এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাঝে কয়জনকে তুই আলাদা করে নিতে পারবি, বলতে পারবি এরা ফুল ম্যান, এরা পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব, সম্পূর্ণ মানব? দুজন কি একজন, তার বেশী নয়। ট্রাজেডিটা কোথায় জানিস? ট্রাজেডি হল তুই আমি, আমরা যে অর্ধমানব– এ সত্যটা উপলব্ধি করার চেষ্টাও নেই আমাদের। ফল দাঁড়ায় যখন অপূর্ণতার অতৃপ্তিতে আবেগ জগতের ভিতটা ওঠে কেঁপে, হৃদয়ের রাজ্যে ধস নামে তখন সহজতম ব্যাখ্যাটিই মনে পড়ে– বলি ওটা দুর্বলতা, মানসিক ভারসাম্যের অভাব। রাবিশ। এতে মনকে বুঝ দেয়া যায়। কিন্তু ব্যধির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। নিজের বক্তৃতায় নিজেই তৃপ্ত কালাম। আমার মুখের উপর কেমন একটা কৃপার হাসি ছুড়ে দিয়ে বলল, বুঝলে বন্ধু! অসাধারণ হতে গিয়ে আনন্যাচারাল মানে অস্বাভাবিক হলেই বিপদ।

তা হলে তুই বলতে চাস সেলিম ভাইর ব্যাপারটা আদতেই কোন মানসিক ব্যাধি নয়?

ব্যাধি তো বটেই। তবে সেটা মস্তিস্কে নয়।

কোথায়?

ওই যে বললাম– শূন্যতার আর অ-পূর্ণতার অতৃপ্তি, কারাগারের হৃদয়হীনতায় তীব্র হয়েছে তার উপলব্ধি। শত ফাটলে তারই প্রকাশ দুঃসহ যন্ত্রণায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে সেলিমভাইর সকল প্রতিরোধ ব্যর্থ গেছে। দুঃখ পাই সেলিমভাইর জন্য। কিন্তু এও আমি জানি বাইরে আপন গৃহের ছায়ায়, স্ত্রী পুত্র কন্যার স্নেহময় পরিবেশে দুদিনেই ভালো হয়ে উঠবেন তিনি।

কালামের বিচার বুদ্ধির উপর আমার অটল আস্থা। তবু শুধালাম, সত্যি বলছিস কালাম?

কেন, গেলো বারে জেলে কিরণদা আর আমাদের সেই কিষান বন্ধু মন্ত মিয়ার কথা মনে নেই তোর?

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। মনে আছে যেদিন খবর পেল মন্তু মিয়া বৌ তার উপায়ান্তর না দেখে নিকে বসেছে তিন গাঁয়ে, হঠাৎ বিকট এক চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মন্তু মিয়া। পাঁচমাস পর ঘোর উন্মাদ অবস্থায়ই মুক্তি পেয়েছিল।

বাইরে গিয়ে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে সুস্থ হয়ে উঠেছিল মন্তু মিয়া। আর কিরণদার খবর তো জানিসই। বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার জাঁকিয়ে বসেছেন। ঠিক দেখবি খোলা হাওয়া আর একটুখানি স্নেহের পরশ, ওতেই সেরে উঠবেন সেলিমভাই।

মনে মনে বললাম তাই যেন হয়। সেলিমভাই আবার ফিরে যাক আপন নীড়ের আশ্রয়ে। বধুর সেবায় প্রিয়তমার কোমল ছোঁয়ায় আপন জনের প্রীতি মমতায় সেরে উঠুক সেলিম ভাই। ফিরে পাক পবিত্রতার দীপ্তি ছড়ানো আনন্দলেপা সেই মুখশ্রী। সেলিমভাই যেমনটি ছিল আবার তেমনটি হোক। সেলিম ভাই সুন্দর হোক। আনন্দময় হোক।

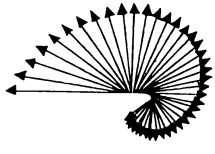

পাঁচই কার্তিক

আমার গরাদ সমান আকাশের উজ্জ্বল কটি জ্যোতিষ্ক, ওদের আজ দেখা নেই। বুঝি মেঘের অবরোধে আটক পড়েছে ওরা।

কারাগারে একটা ব্যাংয়ের আবির্ভাব হয়েছে। কোত্থেকে কে জানে। বাগানের পেছনে নর্দমায় বসে একঘেঁয়ে ডেকে চলেছে রাতের সেই প্রথম পহর থেকে। বাতি ডিম করে শুয়ে পড়েছে সবাই। আমি যেমন গরাদের দিকে মুখ রেখে বসি তেমনি বসেছি। আর সবাই শুয়ে পড়লে যারা শোয়া ছেড়ে সর্তক পায়ে উঠে পড়ে সেই টেলকু বেলকু ওরাও বেরিয়ে পড়েছে নৈশ বিহারে। কবির বুকে ব্যথা। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরময় নিশুতি স্তব্ধতা। বাইরের কেউ জেগে নেই। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চৌখা পাহারা। শুধু জেগে আছে গুমটি ঘরের সন্ধানী বাতি। তীব্র আলো বিচ্ছুরিত করে আহবান করে চলেছে পতংগকুলকে।

স্তব্ধতা ভেংগে পাখা ঝাপটিয়ে বাক বাকুম ডেকে উঠল মন্টুর কবুতরটা। এ গভীর রাতে কেন যেন ওড়বার ইচ্ছে জেগেছে ওর। ঘরের এপাশ ওপাশ একবার উড়ে এসেই আবার ঢুকে পড়ল শার্সির খুপরিতে।

মন্টু নেই সেটা এ্যদ্দিনে টের পেয়েছে ও। টের পেয়েছে বলেই আমার বাড়িয়ে দেয়া হাতের তালু থেকে খুঁদ খেতে আসেনা। মন্টুর শূণ্য বিছানাটার উপরই বার বার উড়ে বেড়ায়।

শুন্য খাটিয়াটার দিকে তাকিয়ে মন্টুর কথাই মনে পড়ে। শূন্য চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে বিদায়ের মুহূর্তে ওর সেই বিষণ্ন কাতর মুখ। এ গারদের জীবনে তিনটি অন্ধকার বছরের অনেক হাসিকান্না, অনেক ছোট বড়ো স্মৃতির সাথে একান্তভাবেই জড়িয়ে রয়েছে মন্টু। তাই ওর হঠাৎ চলে যাওয়ায় যে ছেদ পড়েছে গারদের জীবনে সেখানে এখনো নতুন গ্রন্থি গড়ে ওঠেনি। হয়তো একারণেই ওর খাটটা গুদামে পাঠিয়ে দেয়ার কথা কেউ ভাবেনি। এ খাটে এখনো বুঝি লেগে রয়েছে মন্টুর স্পর্শ। হাসিব খলিল মান্নান, ওরা এ সীটে বসে গল্প করে, তাস খেলে।

বেশ। কিন্তু সময় এলো যখন ওই তৈরী করা ছকের ভেতর আবদ্ধ থাকতে চাইলো না জীবনটা। ধারণা আর বাস্তবে সৃষ্টি হল সংঘাত। বড় নিষ্ঠুর, বড় করুণ এই সংঘাত। বারুদ জমে জমে যেমন অনিবার্য করে তোলে বিস্ফোরণ এও তেমনি।

কিন্তু কালাম, আমি তো জানি আমার জীবন আর আমার ধারণায় যদি কখনো সংঘাত আসে আমি থাকবো জীবনেরই পক্ষে। কালামকে থামিয়ে বললাম।

কিন্তু সেলিমভাই তা পারছেন না। তাই তো এতো কষ্ট ওর।

টেলকুটা কোত্থেকে হঠাৎ ছুটে এসে এক লাফে উঠে বসেছে কালামের কোলে। ওকে আদর দিতে দিতে বলল কালাম, জানিস, যারা সত্যিকারের পুরুষ, জীবন তাদের আত্মবশ এটা মেনে নিয়েও মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কথা মনে হায় আমার?

কী? কৌতূহলী হয়েই শুধালাম।

এমন কিছু অনিবার্যতা রয়েছে জীবনের যা চেপে রাখা যায়না। আজ তুমি চেপে রাখলে কিন্তু কাল তা-ই ফেটে পড়বে ভীষণ হিংস্রতায়, ছত্রখান করে দেবে তোমায়। তুমি তখন তোমারই আয়ত্ত্বের বাইরে। জীবনের এই অনিবার্যতার শক্তিটা অন্ধ নিষ্ঠুর ভয়ংকর।

আমাকে নীরব দেখে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ফিকে রকমের হাসল, বলল ভাবছিস ভূয়ো দর্শন?

না না। তুই বলে যা।

ক্যালকুলেট করে জীবন চলা। সে এক আহাম্মকী, জীবন কখনও হিসেব মানে না। এ কথাটা আমরা খুব জোর গলায় বলি। তাই না?

বলি, কেননা এটাই সত্য।

কালাম আবারও সেই ফিকে রকমের হাসল। বললো ফের, অথচ কিছুটা হিসেব প্রয়োজন। সেদিন মন্তুমিয়ার কথা হচ্ছিল না? ভূমি-হীন নিরক্ষর জংগী কিষান। ও শুধু জেনে নিয়েছিল লড়তে হবে। কেননা লড়াই করলেই জমি আসবে। জমির আকর্ষণ ওর কাছে অপ্রতিরোধ্য। হুঁ সেটাই তো স্বাভাবিক।

জমি আসবে, জমি আসছে– ওর হিসেবের এটাই ছিল মূল কথা। কিন্তু আর একটা হিসেব ও নিজেও করে নি। কেউ ওকে বুঝিয়েও দেয়নি। লড়তে গেলে হারতে হতে পারে, কারারুদ্ধ হতে পারে এ জীবনের জন্য। আর তখন হারাতে হবে বৌ হিরামনকে। মন্তুমিয়া জেলে এলো। পাঁচ মাস বাদেই হিরামন নিকে বসল ভিন গাঁয়ে। এ আঘাত সইতে পারলোনা জংগী মন্তু।

বড়্ডো অবাস্তব কথা বলছিস কালাম। এ সব কি আগে ভাগে চিন্তা করে রাখার ব্যাপার? নাকি চিন্তা করে রাখা সম্ভব?

আমার কথায় বাধাপ্রাপ্তত হলনা কালাম। ও বলে চলেছে। আর কিরনদা? যাকে বলে মরালিষ্ট, সাত্ত্বিক পুরুষ, জীবনে কোন দিন মা আর দিদি ছাড়া অন্যকোন নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাননি। এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে দেশোদ্ধারের কাজে কেটেছে তাঁর দিন। সেই লোক বিয়াল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ করে পড়ে গেল প্রেমে। বিয়ে করল। বিয়ের একমাস বাদেই হাতে পড়লো হাত কড়া।

তুই কি বলতে চাস কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই কাজটা করেছিলেন কিরণ দা? চেঁচিয়ে উঠলাম।

এবারও আমার কথায় কান না দিয়ে নিজেরটাই বলে চলল কালাম। ঘোর মরালিষ্ট, ঘোর নীতিবাদী। প্রেমে পড়লে কি দশা হয় বুঝতেই পারিস তায় আবার পড়তি বয়সের বিয়ে। প্রেম সাগরে কিরণদা শুধু ডুবলেন না, স্রেফ তলিয়ে গেলেন। মাত্র একটি মাস, তার পরই বিচ্ছেদ। সইতে পারলেন না কিরণদা। যাকে বলে ইম্যোশ্যানাল ব্রেকডাউন তাই হল, দেহ মন স্নায়ু সবই তার বিকল হল। যে লোক ভুলেও কোন দিন একটি উপন্যাসের পাতা উল্টোয়নি, যার একমাত্র জানা কবিতা 'হে মোর দূর্ভাগা দেশ,' সেই কিরণদা অবিরাম কবিতা লিখে চললেন। সবই প্রেমের কবিতা। কোন কোনটি যৌন বিশ্লেষণে এমন অশ্লীল যে অতি বড়ো লজ্জাহীনও লাল হয়ে উঠবে। এই কবিতা লিখতে লিখতেই পাগল হয়ে গেলেন কিরণদা----- আচ্ছা কিরণদার কথা ছাড়।---- হিমা---হিমা তো আমার জীবনের অজস্র সীমাবদ্ধতা, সীমাহীন অনিশ্চয়তা– আপন চোখে দেখেছে জেনেছে, জেনে শুনেই আমাকে মন দিয়েছে, সেই হিমাও যে পারলনা যখন-----

দোহাই তোর কালাম, একটু থাম। দিনে দিনে তুই সত্যি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিস। মন্তু মিয়া কিরণদা, তাদের সাথে আবার হিমার কথা তুলছিস কেন? বিরক্ত হয়েই বললাম।

তুলছি এই জন্য জাষ্ট টু শো ইউ, আঙ্গুল দিয়ে তোকে দেখানোর জন্য যে জীবনটাকে তুই অস্বীকার করেছিস, বলছিস– জয় করেছিস তুই জীবনের ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ চাওয়াগুলোকে– কিন্তু সেই ইনসিগনিফিকেন্ট লাইফ হন্টস ইউ লাইক এ গোষ্ট ইভেন ইন ইওর সাবলিমেশন, সেই তুচ্ছ জীবনটাই ভূতের মতো তোকে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে হামেদ– ইউ কান্ট এসকেপ লাইফ, জীবনকে ফাঁকি দেয়ার যো নেই। এ এমন এক শাইলক নিজের পাওনাটা যে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিবেই। জাষ্ট থিঙ্ক, চিন্তা করতো সেই মুহূর্তটির কথা হোয়েন লাইফ টেক্‌স্ ইট্‌স্ রেভেঞ্জ, জীবন যখন হিংস্র আক্রোশে আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করে– কী ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক আর বেদনাময় সেই মুহূর্ত! ভেবে দেখতো ঠিক সেই মুহূর্তটির কথা। মন্তুমিয়া যখন জানতে পেল হিরামন আর নেই তার অধিকারে, যখন কিরণদার পেছনে রুদ্ধ হোল লৌহ কপাট, যখন হিমা–

প্লিজ কালাম হিমার ভালোবাসাকে এমন করে খাটো করিসনে!

আশ্চর্য! আমার মুখের কথাটা শেষ হবার আগেই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে কালাম। কেমন আনমনা একটু যেন উদাসীন। এইমাত্র যে বিষয়টা নিয়ে তর্ক করছিল সেটাও যেন ভুলে গেছে ও। গারদের ফাঁকে অনেক দূরে যে আকাশ সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কালাম।

মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশটা। ঢাকা পড়েছে দিনের আলো। চেয়ারে বসেই কি এক অস্থিরতায় ছটফট করে কালাম। মেঘ দেখলে কোনদিনই শান্ত থাকতে পারে না ও। মেঘ ওকে অস্থির করে তোলে। বিষন্ন মন্থরগতি শ্রাবণী মেঘ। সেই মেঘের উপর চোখ রেখে স্থান কাল পাত্র সবই বুঝি ভুলে গেছে কালাম।

গ-দার সীটের পাশে বসেই তর্ক চলছিল। গ-দা, কবি, মন্টু ওরা সবাই কান পেতে শুনছিল, এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম। একমাত্র গ-দা যেন শোনেননি কিছুই এমনি ভাবে সিলিংয়ের দিকে মুখ করে আধ-শোয়া।

কি গ-দা।। তীর্থের কাকের মত কড়িবর্গার দিকে চেয়ে কেন? কি ওখানে? কবির কেনেস্তারার মতো গলাটা ক্যানক্যানিয়ে উঠল।

পরম ব্রহ্মের মতো বললেন গ-দা, এ বড়ো কঠিন ঠাঁইরে দাদা, এ বড় কঠিন ঠাঁই।

মেঘের ডাকে চঞ্চল কালাম। ওর হাত ওর পা ওর এই দেহখানি যেন কোথায় ছুটে যেতে চায়। কিন্তু স্থির ওর চোখের দৃষ্টি, পলকহীন চোখের পাতা।

বিড় বিড় করে যেন ঠোঁট নাড়ছে ও। মনে হল কোন দোয়া পড়ছে। কানটা আর একটু বাড়িয়ে নিলাম ওর দিকে। শুনলাম, কিছুক্ষণ আগের সেই কথাগুলোই অতি দ্রুত আর বিড় বিড় স্বরে বলে চলেছেও। ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ জীবনটাই ভূতের মতো আমাকে অনুসরণ করে চলেছে ইয়েস ইয়েস হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। কিন্তু এখানেই তো আমার সংগ্রাম। আই মাষ্ট ফাইট ইট আউট।

এই ওঠ চল চল। দেখছ না কি সুন্দর মেঘ করছে আকাশে? বলতে বলতে সহসাই উঠে দাঁড়াল কালাম। কারো জন্য অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল চাতালে। দিনের আকাশে যখন মেঘের নৃত্য, গারদ যখন খোলা, ও কি ঘরে বসে থাকতে পারে?

আমি অবাক হই মেঘের ডাকে মন যার আনচান, আকাশে মেঘ দেখলেই যে ছুটে যায় অঙ্গনে, সেই মানুষটি তিনটি বছর কেমন করে কাটিয়ে এলো গবাক্ষহীন সেলের নির্জনতায়? বদ্ধ-গরাদ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ও কেমন করে খুঁজে পেত এই মেঘ, এই আকাশ?

আচ্ছা হামেদ ভাই?

মন্টুর গলা পেয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ওর দিকে।

কালামভাই কি খুব পণ্ডিত লোক? শুধাল মন্টু।

না।

কবি?

তাও না।

এই জেলে এসেই কালামের সাথে মন্টুর পরিচয়। আগে চিনতনা। নিকট থেকে দেখে শুনেই হয়ত কালাম সম্পর্কেও ধারণা করে নিয়েছে কালাম হয় পণ্ডিত ব্যক্তি নতুবা কবি।

আমার উত্তরটা ওর ধারণার সাথে মিললনা দেখে স্পষ্টই হতাশ হল মন্টু।

জানেন হামেদ ভাই? প্রথম এসে দেখলাম একতাড়া স্লিপ কাগজ আর একটা কলম নিয়ে দিনভর জেলখানার ওই অফিসটার পেছনে লেগেই আছে লোকটা। অফিসটাকে যেন এক মুহূর্তও স্বস্তি দেবেনা। আর যতো রাজ্যের হিসেব– জুতো জামা তেল সাবান মায় ঝাড় কাঠি। দু'জন জমাদার আর অফিস সেপাইটার দফা রফা করে ছাড়ছে সারাক্ষণ। তখন মনে হয়েছিল লোকটা বুঝি এ কাজেরই এক্সপার্ট, বিদ্যে-বুদ্ধি তেমন নেই। মন্টু থামলো।

শুধালাম, তারপর?

তারপর কথাবার্তা শুনে মনে হল, না লোকটা জ্ঞানীও বটে।

আমিও বললাম, বটে?

আর আজকের কথা শুনে মনে হল কালামভাই বুঝি ভাবুক এবং কবি কিন্তু,-------।

কিন্তু কি?

কিন্তু কালাম ভাই লেখেনা কেন?

মন্টুর প্রশ্ন শুনে ঘরশুদ্ধ লোক গলা ছেড়ে হেসে উঠল। লজ্জায় অল্প বয়েসী মেয়ের মতোই লাল হয়ে উঠলো ও।

আমি বললাম লেখাটেখার দিকে মন নেই ওর। তুই একবার বলে দেখনা।

যাহ্ আমার কথা শুনবে কেন? আরো লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই বুঝি উঠে চলে গেল মন্টু।

শ্রাবণ আকাশ শোকাতুরার মতো কান্নার ঢলে বুক ভাসিয়ে চলেছে। শিকের ফাঁকে চোখ গলিয়ে দেখি চাতকের মতো মুখটাকে আকাশের দিকে তুলে রেখেছে কালাম। যেন বৃষ্টি ফোঁটার মুখে মুখে চুম্বন এঁকে চলেছে। বৃষ্টিধারা ধুয়ে দিয়েছে ওর সর্বাঙ্গ।

তেসরা ভাদ্র

চার মাস পর মায়ের চিঠি পেলাম।

মা লিখেছেন।

ছয়মাস তোর কোন পত্র নেই। বুড়ী মাটিকে কি ভুলে গেছিস? তুই কি এতোই নিষ্ঠুর? বাছা! দশমাস তোকে গর্ভে ধরেছি। বুকের দুধ দিয়েছি। কোলে পিঠে করেছি। চোখে চোখে রেখেছি। তবে না এত বড়টি হয়েছিস? এ সব কথা কি মনে আছে তোর?

তুই আমার প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তানকে নিয়ে মায়ের কতো সাধ, কতো আহলাদ। আমার কতোদিনের সাধ বৌমা আসবে ঘরে। নাতী নাত-কুড়ে ভরে থাকবে আমার সংসার। নামে ধামে ধনে-রত্নে বিদ্যাবুদ্ধিতে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে আমার ছেলে। কই একটি সাধ আমার পূরণ করলি তুই?

বাছা আমার। তোর পথের পানে চেয়ে চেয়ে চোখ যে আমার অন্ধ হয়ে গেল! তুই কি আসবি না? তোকে কবে ছাড়বে ওরা? বছরের পর বছর কেটে যায়, তোর গায়ে হাত বুলিয়ে তোর মুখ দেখে নয়ন আমার সার্থক হয়না। ওরে নিষ্ঠুর ছেলে মায়ের পক্ষে এ যে কতো বড় কষ্ট, কতো বড় দুঃখ সে কি বুঝিসনে তোরা?

তোর বাবা চোখ বুজবার আগে তোর সেই ছোট্ট ভাই আর বোনটির দায়িত্ব যে তোকেই দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা কি ভুলে গেছিস?

বড় ভাইর কথা বলে বলে ওরা শুধু চোখের জল ফেলে। ওরা বোঝে না ওদের কেন এমন দুর্ভাগ্য।

ওরা শুনেছে তোর সাথে দেখা করা যায়। সেই থেকে আমার মাথার পোকা বের করে চলেছে। কিন্তু কে ওদের নিয়ে যাবে অতো দূরের শহরে? ঢাকায় গিয়ে কোথায় উঠবে ওরা?

এক বছর ধরে এর ওর কতো জনকে কতো কাকুতি মিনতি করে শেষ পর্যন্ত সদরে গিয়েছিলাম। চশমা পাল্টিয়েছি। কিন্তু এতেও বিশেষ স্পষ্ট দেখি না। একহাত দূরের মানুষ ঝাপসা। ডাক্তার বলেছেন এই দৃষ্টিটুকু বেশী দিন থাকবে না। বাছা আমার! চোখের আমার এইটুকু জ্যোতি থাকতে থাকতেই চলে আয়

তুই। দেরী হলে তোকে যে চিনতে পারব না বাছা। কাছে পেয়েও মুখটা তোর দেখতে পাবনা। বাবা আমার, মণি আমার চলে আয়। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে আয়।

অনেকক্ষণ ভাবলাম কি জবাব দেব এ চিঠির। কলম হাতে নিয়ে বসে রইলাম। জবাব যেন আসতে চায় না। দুপুর পেরিয়ে বিকেল এলো। বিকেলেও লেখা হলনা। শেষ পর্যন্তত রাতের নির্জনতায় লিখে ফেললাম। কলমের ডগায় যা এলো তাই লিখলাম।

মা, আমি তোমার অধম অপদার্থ সন্তান। সারা জীবন আমাকে নিয়ে শুধু কষ্টই করলে, শুধু দুঃখই পেলে। তোমার সংসারে সাচ্ছ্যন্দের জন্য তোমাকে সুখী করার জন্য, তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না আমি। তোমার এই অযোগ্য সন্তানকে তুমি ক্ষমা করে দিও, মা।

মা, তোমার কথা আমার সব সময় মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে। ইচ্ছে করে তোমার কোলে বসে আদর খাই সেই ছোট বেলার মতো। ইতি।

চিঠিটা শেষ করেই অনুতাপে জ্বলে উঠল মনটা। মায়ের কাছেও মিথ্যে লিখব? মিথ্যে করে লিখব তোমার কথা মনে পড়ে? চিঠিটা কারাগারের ডাকবাক্সে ফেলবার আগে কেটে দিলাম শেষের কটি লাইন। পৃথিবীতে এমন কেউ থাকা উচিত যার সুমুখে বুজে আসে ছলচাতুরী প্রতারণার কণ্ঠ, যার সুমুখে বহন করা যায়না কোন মিথ্যার বোঝা। মা ছাড়া আর কে আছে এমন?

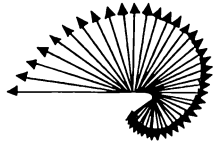

ষোলই ভাদ্র

প্রাচীরঘেরা জগতের এই বিচিত্র মানুষ। একটু দূর থেকে একটু বা উঁচুতে বসে দেখলে কেমন দেখায় ওদের? মনে হবে মৃত্যুগুহায় কোন প্রাণের সাধনায় মেতে আছে? অথবা অবসাদে ঝিমিয়ে-আসা-নাড়ী ধুকধুক প্রতীক্ষায় শুধু দিন গুণে চলেছে? নিকট থেকে কী কিছু বোঝা যায়?

একটু দূর থেকে, হ্যাঁ তেতালা সমান উঁচু ওই টাওয়ার থেকে যেখানে সঙ্গীন হাতে সজাগ শান্ত্রী– সে টাওয়ার থেকে কেমন দেখায় এই কারাগার আর তার ভেতরের এই আশ্চর্য মানুষগুলোকে? শরীরটাকে টান করে রাইফেলটাকে সুমুখে ধরে নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে থাকে শান্ত্রী। অথবা হাঁটে ধীর পায়ে সামরিক বাহিনীর কোন দক্ষ সৈনিকের মতো নিখুঁত পটুতায়। মুখটা ওর একেবারেই ভাবলেশহীন। সেই ভাবলেশহীন মুখে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ। ওর হাতের বেয়নেটের মতো তীক্ষ্ণ আর শানানো। কারাগারের প্রতি প্রকোষ্ঠে ওর সতর্ক নজর, হয়তো সে জন্যই ভাবলেশহীন মুখে অমন তীক্ষ্ণ চোখটা ওকে মানিয়ে যায়।

ওরা অনেক জন। পহরে পহরে ওদেরও বদলী হয়। কিন্তু আশ্চর্য! তফাৎটা কিছুতেই যেন করতে পারি না আমি। খাকি পোষাকে সংগীন হাতে সিনাটা টান করে ব্যাধের চোখ নিয়ে পহরে পহরে যারা দাঁড়িয়ে থাকে অথবা মার্চ করে বেড়ায় ওই উঁচু টাওয়ারের উপর, ওদের চেহারায় ওদের চলায়, মাত্র সত্তর কি আশি গজ দূর থেকেও কোন পার্থক্য টানতে পারিনি আমি। আমার মনে হয়েছে একই জন এমনি করে দিনের পর দিন পাহারা দিয়ে চলেছে কারাবাসীদের। ওর ক্লান্তি নেই। ওর শ্রান্তি নেই। আমি ভাবি এই শান্ত্রীর দৃষ্টিতেই বা কেমন দেখায় আমাদের? হয়ত ওর চোখেও আমাদের চেহারাটা এমনি সমান একাকার। তফাৎ নেই একের সাথে অন্যের। সকলেরই এক অবয়ব এক পরিচয়– কয়েদী। একটু সাদা কাপড়, থাকা খাওয়ার একটু সুব্যবস্থা– অতএব এরা হোল সিয়াসি কয়েদী।

মাথার ওপরে একেবারে সিলিং ঘেঁসা শার্শির ওই কবুতরটা, নীল কাঁচের মতো স্বচ্ছ টলটলে যার চোখ? সেখান থেকে ওর ওই কাঁচনীল দৃষ্টিতে কেমন দেখায় এই সিয়াসি কয়েদীগুলোকে?

এখানে একমাত্র মন্টুর সাথেই ওর ভাব। খুদভর্তি হাতের তালুটা বাড়িয়ে মন্টু যখন ডাকে পাখার ঝটাপুটি তুলে ও নেমে আসে। খেয়েই আবার ফিরে যায় শার্সির ফাঁকে। নির্লিপ্ত উদাসীন চোখজোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নীচের এই বিচিত্র মানুষগুলোকে। কী ভাবে ও কে জানে।

চোখ জোড়া আমার হেঁটে বেড়ায়।

ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং বুঝলেনা? সোজা বাংলায় টাকা নেই পকেটে কিন্তু খরিদ কর।

সে আবার কি রকম?

ভবিষ্যতে আয় বাড়বে, টাকা আসবে সেই ভরসায় আগাম খরচ করছ। রাষ্ট্রের খরচা মানে তো তোমার আমার মাছ কেনা নয়? একটা বড় খরচ উন্নয়ন ব্যয়।

মন্টুকে অর্থশাস্ত্র পড়াচ্ছে কালাম। ও বিষয়টা আমার কাছে হিব্রু। তাই কালামের কাছে পড়তে হয় মন্টুকে।

হঠাৎ বাকবাকুম ডেকে উঠেছে মন্টুর পায়রাটা। ওর শেলফের উপর দিয়ে উড়ে গেছে এক চক্কোর। হয়তো খাবার চাইছে। এক মিনিট কালাম ভাই, বইটা বন্ধ করে চলে আসে মন্টু। টেবিলে রাখা তশতরিতে মুঠো খানিক খুদ রেখে ফিরে যায় কালামের টেবিলে।

লক্ষ্মী মেয়ে এখানে শো। ওটা তো ভাইয়ের বিছানা ওটা ওকেই ছেড়ে দে।

আর শোন্ ও বাড়িতে যাবিনে কখ্খনো। দেখছিসনা ও বাড়ির মান্নান তোকে পছন্দ করে না? হ্যাঁ ঠিক তো? আমার কথা যদি শুনিস তবে নাশতার সাথে আরো আধ ছটাক দুধ বাড়িয়ে দেব বুঝলি?

এ্যাঁ–ও!

হ্যাঁ, সব বুঝিস তুই। আরে আরে এই দুষ্টু! তুই আবার স্যাণ্ডেল কামড়াচ্ছিস? খাবি নাকি?------- আমার চোখে চোখ পড়তেই লাজুক হাসিতে মুখ নামিয়ে নেন গ-দা। টেলকা বেলকার সাথে ওঁর এই একান্ত অন্তরঙ্গ কথাবার্তাগুলো শুনে ফেললাম। এই জন্যই বুঝি লজ্জা গ-দার। গ-দাকে অস্বস্তি থেকে বাঁচানোর জন্যই বেরিয়ে এলাম। চত্বরটা পেরিয়ে চলে এলাম দুনম্বর বাড়িতে।

বৌ ছেলেমেয়ের মায়া ছেড়েছিস? গোটা জীবন নিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিস! আর এই সামান্য কয়েকটা সিগারেটের মায়া ছাড়তে পারিস না?

রশিদকে হেদায়েত করেছেন অ-দা।

দৈনিক চারটের বেশী সিগারেট ওকে দেয়া যায় না। কিন্তু তাতে কিছুই হয়না ওর। কালাম আর সনুমামার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়। ব্যাপারটা সকলের চোখে পড়লেও কোন পক্ষ থেকেই আপত্তির কোন কারণ দেখা দেয়নি। কিন্তু মুখখোড় মান্নান, সেই আপত্তি তুলেছিল। উঠতে বসতে খোঁচায় খোঁচায় জর্জরিত করে তুলেছিল রশিদকে। অমন করে চেয়ে চেয়ে খেতে লজ্জা করে না তোর? ঝাড় মারিসনা কেন অমন নেশার কপালে?

মান্নানের খোঁচায় অতিষ্ঠ হয়েই চাওয়াটা কিছুদিন বুঝি মুলতুবি রেখেছিল রশিদ। তারপর যেইকে সেই। আবার শুরু হয়েছে চাওয়ার পালা। সেই সাথে মান্নানের খোঁচা। ছেলেটা তোর দুধ খেতে পায় না পেট ভরে। আর তুই বাড়ি থেকে সিগারেট আনাস কোন শরমে? বৌর দোহাই পাড়ছিস? গছিয়ে দিয়ে যায় বৌ? মিথ্যে কথা। না হয় আনলই বৌ– তোকে ভালবাসে, জানে নেশা তোর বেজায়, তাই বলে গ্রহণ করবি তুই? আচ্ছা না হায় নিলি, কিন্তু ওই দিয়েই তো তোর চলা উচিত। তা নয়, তুই নিবি জেনারেল কোটা থেকে, বৌর কাছ থেকেও আনাবি, এদিক ওদিকেও হাত পাতবি। এ কেমন ধারা স্বভাব? এ স্বভাব নিয়ে তুই দেশের কাজে নেমেছিস? ছিঃ।

এবার কিন্তু মান্নানের খোঁচাতেও কাজ হয়নি। ওর খোঁচা খোঁচা কথা, তেড়া চোখের চাহনী, উঠতে বসতে বক্রোক্তি সব কিছু অস্বীকার করে বাড়ি থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ সিগারেট আনিয়েছে রশিদ। কালামের কাছ থেকেও চেয়ে নিয়েছে আর মান্নানকে দেখিয়ে দেখিয়েই এন্তার ফুঁকে চলেছে। এ দৃশ্য মান্নানের পক্ষে অসহ্য। অগত্যা অ-দার শরণাপন্ন হয়েছে মান্নান। অ-দা যদি দেশপ্রেমের আবেদন জানিয়েও কিছুটা সংযম শেখাতে পারে রশিদকে।

একটা নেশা বই আর কিছু তো নয়? তা ছাড়া ভেবে দেখ ফায়দা আছে কিছু? কিছু নেই। অথচ মন্দের ফিরিস্তি বলে শেষ করা যায় না। স্বাস্থ্য নষ্ট অর্থ নষ্ট তায় আবার এই কষ্টের সংসারে। আজ কাল ডাক্তাররা বলছেন ধুমপান থেকে ক্যানসারও হতে পারে।

হতে পারে না হয়। খানিক দূরে বসেছিল মান্নান সে-ই শুধরে দিল।

তার উপর না-হক যতো কথা শোনা এর ওর। কী হয় ছেড়ে দিলে? দুদিন একটু মাথা ধরবে। কেমন কেমন করবে শরীরটা। দু'দিনই। তারপর দেখবি সব ঠিক। জীবনের লোভ লিপ্সা অনেক কিছুইতো ছাড়লি। আর এই কয়টি সিগারেটের নেশা ছাড়তে পারবিনে? নিশ্চয়ই পারবি। দেখ চেষ্টা করে।

রশিদ অনেক কিছু পারে। কষ্ট সইতে পারে দুঃখ বহন করতে পারে দিনের পর দিন। মাইলের পর মাইল হেঁটে চলতে পারে। চোঙ্গা হাতে নিয়ে গলা ফাটাতে ফাটাতে এই ঢাকা শহরটাকে চষে ফেলতে পারে। পোষ্টার লিখতে পারে রাত জেগে। এ সব কাজে কারো পিছে নয় ওর স্থান। আজ বন্দীজীবনের যন্ত্রণা সইছে, দরকার পড়লে আরো সইবে। সহায়হীন, প্রায় উপবাসী পরিবারের দুঃখটা সয়ে চলেছে। নব পরিণীতার সাথে হঠাৎ বিচ্ছেদ, সেও সয়ে আসছে গেল দু'বছর ধরে। আরো সইবে। খাওয়ার প্রতি ওর লোভ নেই, না খেয়েও থাকতে পারে। কিন্তু পারেনা শুধু ধূমপানটা ছাড়তে। ছাড়বার কথা উঠলেই মাথায় ওর বাজ পড়ে, এতটুকু হয়ে যায় ওর মুখখানা।

ভেতরটা ওর খচখচ করে না অপরাধবোধে এমন নয়। এই ছাই ভস্ম ছেড়ে দেয়ার কথাটা কতোদিন ভেবেছে ও, কতোবার মনে মনে প্রতিজ্ঞাও নিয়েছে। কিন্তু কী যে বিড়ম্বনা! ওর ধূমপায়ী স্বভাবের দুর্নিবার চাহিদার মুখে প্রতিবারই ভাঙ্গতে হয়েছে সে প্রতিজ্ঞা।

যেন ওর মরণের হুকুম এসেছে, তেমনি মুখ করে চিবুক নামিয়ে বসে আছে রশিদ। ওর এই করুণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অতি বড় পাষণ্ডেরও বুঝি দয়া হয়। কিন্তু দয়া হয়না মান্নানের। দয়া হয়না খলিলের। ওরা বুঝি পাষণ্ডের চেয়েও নির্মম। রশিদের প্রতি এতটুকু দয়া নেই ওদের। শুধু যেন তক্কে তক্কে থাকে। বেচারি রশিদ কখন কার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে খেল অমনি এই দুই দারোগা লাফিয়ে পড়ল সুমুখে।

আমার মনে হয়েছে এটা ওদের বাড়াবাড়ি। নিজে আমি খাই না সিগারেট। সহ্য হয়না। সঙ্গতিও নেই। আজ আমার মনে হয় সিগারেটটা অভ্যেস করা উচিত ছিল আমার। অন্ততঃ পক্ষে দু'একটা সলা অফার করতে পারতাম রশিদকে।

দেশকর্মী। ব্রত তার পবিত্র। পরীক্ষা তার কঠিন। সে পরীক্ষায় তুই উত্তীর্ণ। অথচ এই একটি ব্যাপারে সংযম নেই তোর? কেন? কেন? একটা জিদ, একটা দৃঢ়সংকল্প জাগিয়ে তুলতে পারিস না মনের ভেতর?

রশিদের করুণ মুখটার দিকে আর এক পলক তাকিয়ে পা বাড়াই সুমুখে। পশ্চিম দিকে মান্নানের সীটে বসে খলিল আর হাসিব তন্ময় হয়ে কি যেন আলাপ করছে। এই ধরনের বুরবুর টুরটুর গোপন গোছের আলাপ ওদের নিত্যদিনের ব্যাপার। এসব গোপনীয় গোলটেবিলে মান্নান অবশ্য সাথী। কিন্তু রশিদকে সংযম শেখাবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে ওদিকেই আজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ও। বিশেষ নজর না দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। থমকে দাঁড়ালাম কথাগুলো শুনে।

বৌ হোক আর যে-ই হোক খাতির নেই আমার কাছে। সোজাসুজি বলে দিলাম। তোমার যদি না পোষায় নিজের পথ দেখ গে। আমার কোন দাবী নেই। ছেলে তুমি নিতে পার রেখেও যেতে পার বড়ভাইর হাওলায়।

হাত মিলা দোস্ত, হাত মিলা। ওই অপদার্থ আর নিকৃষ্ট জাতটাকে ঠিক এরকম ভাবেই বলতে হয়। যেন মহাখুসিতে গলগলিয়ে উঠল-হাসিব। শুধাল– কথাটা শুনে তাহ্‌মিনার মুখের অবস্থাটা কেমন হল বল দেখি? কী বলল ও?

আরে সেখানেই তো মুশকিল। আমি ভেবেছিলাম যেমন জেদী মেয়ে তখ্‌খুনি রাজী হয়ে যাবে। ল্যাটা চুকিয়ে আমিও রেহাই পাব। কিন্তু মেয়েটা কি করল জানিস?

স্মৃতির পর্দা সরিয়ে বুঝি জেগে উঠল কোন করুণ ছবি। মুহূর্তের জন্য

কেমন আনমনা হয়ে মুখটা জানালার দিকে ঘুরিয়ে নিল খলিল।

হ্যাঁ, কি করল? ঔৎসুক্যটা চেপে রাখতে পারছেনা হাসিব।

দরদর কেঁদে ফেলল মেয়েটা। আমি স্রেফ থ।

কেঁদে ফেলল? যেন কান্নাটা ভষীণ অন্যায় হয়ে গেছে তাহ্‌মিনার তেমনি ক্ষণ্ন চোখ হাসিবের।

আসলে এমন অবস্থায় কেঁদে ফেলতে পারে কোন মেয়ে, হাসিবের নারী-অনভিজ্ঞ জীবনে এটা ধারণাতীত। সব উৎসাহ ওর উবে গেছে। নিঃশব্দে চেয়ে আছে করুণ-হয়ে-আসা খলিলের মুখের দিকে।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাওয়ার দশা। ভেবে দেখ সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষদের সুমখে একটা মেয়ে কী অবস্থায় দরদরিয়ে কাঁদতে পারে।

কান্না ভাঙ্গা তাহ্‌মিনার মুখখানাই বুঝি জেগে উঠেছে গরাদের ওপাশে। গরাদের দিকে কেমন ভিজে চোখে তাকিয়ে রইল খলিল। ওর খেয়াল নেই, যে নির্মম বিদ্রূপ আর পরিহাস ঢেলে আলোচনার সুত্রপাত করেছিল ও, তার সাথে এই আর্দ্রকণ্ঠ আর ভিজে চোখের এতটুকু সামঞ্জস্য নেই।

তুই মাফ চাইলি না? আন্তরিকভাবেই শুধাল হাসিব।

যা বললাম তার উপর মাফ চাওয়ার অর্থ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে–

দাঁড়ালাম না। আড়ি পেতে কথা শোনা চুরি করে অপরের চিঠি পড়ার মতোই গর্হিত অন্যায়।

মন্টুর পায়রাটা পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে চলে গেল। সহসা বুঝি বাইরের ডাক পেয়েছে ও।

এক দংগল কাক একটা অসহায় শকুনের পেছনে লেগেছে। চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে ক্রমাগত তাড়া করে চলেছে শকুনটাকে। এমনিতেই শান্ত প্রকৃতির শকুন। তার উপর গায়ে গতরে ভারি। কাকের তুরন্দ গতি আর কেকো স্বভাবের সাথে এঁটে ওঠার বুদ্ধিও নেই তার। দূর্ভেদ্য ব্যূহটা ভেদ করার অন্য কোন উপায় না দেখে বার কয় গোত্তা খেল শকুনটা, গোত্তা খেতে খেতে হঠাৎ ঝুপ করে পড়ে গেল নীচের দিকে। তাতেও ফল হলনা। কয়েকজোড়া অপেক্ষাকৃত তরুণ কাক অমনি ঝাপটে ধরেছে শকুনটাকে। শকুনটা প্রাণভয়েই দৌড়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে কাকের দল।

কখন বৃষ্টি হয়েছে। শেফালিপাতা টপ টপ ফোঁটা ঝরিয়ে চলেছে এখনো। সাদা আকাশে এখন ধোঁয়া-রং মেঘের বিচিত্র আঁকিবুঁকি। ভিজে হাওয়ায় যেন ঘুমের আমেজ।

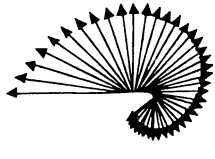

তেইশে ভাদ্র

অকারণ বাক্যের কোলাহল নয়, টিকাটিপ্পুনি মন্তব্য নয়, শুধু নিঃশব্দে মানুষগুলোকে দেখে যাওয়া। ওদের দেখা এবং চেনা– একান্ত নিভৃত মুহূর্তে, যখন ওরা অসতর্ক। এই দেখায় এবং জানায় বিচিত্র আনন্দ। তাই চোখ আমার হেঁটে বেড়ায়।

চোখ আমার হেঁটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে কী এক অসম্ভব আর অভাবিতের উপর দৃষ্টি পড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

নাম ওর অতীশ। শান্ত মুখচোরা স্বভাব। অথচ সবাই বলে অশান্ত অতীশ। ওর মুখে ওর কথায় ওর চলনে কোথাও অশান্তির চিহ্ন নেই তবু ও অশান্ত অতীশ।

হাটাহাটি খেলাধূলো গল্প মজলিস, এ সবে কোন আগ্রহ নেই অতীশের। এ সব থেকে অনেক দূরে দু'নম্বর ঘরের পশ্চিম কোণের খাটটিতে অতীশের নিঃশব্দ অস্তিত্ব। ও যে আছে এ কথাটাই যেন মনে থাকেনা। কখনো সখনো যখন হঠাৎ মনে পড়েছে মাসের উপর কিম্বা দু'মাসেও আলাপ হয় না অতীশের সাথে তখন প্রোগ্রাম করে ওর সীটে এসে বসেছি। দুটো বা কথা বলেছি। এমনি করেই অতীশের সাথে সুদীর্ঘ দিনের পরিচয়টা উটকো ভাবে ঝালিয়ে আসতে হয়।

অতীশ কি হাসে? গলা ছেড়ে অথবা মৃদু ঝলকে? বছরে দুবার কি একবার? যে মানুষ হাসে তাকে চোখে পড়বেই। অতীশকে চোখে পড়ে না।

অতীশ কি বোবা? যে বোবা সেও তো হাত পা নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে ভাষাহীন কণ্ঠে বিচিত্র শব্দ তুলে জানিয়ে দেয় নিজের অস্তিত্বটা। অতীশ নীরব কর্মী। একান্ত প্রয়োজনেও দুচারটি হুঁ হাঁর বেশী কথা নেই ওর মুখে। ওর হাঁটাটাও টের পায় না কেউ। ও হাঁটে খালি পায়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে।

অতীশ পড়ে এবং লেখে। লেখার ভেতর চিঠি লিখতেই ওর আনন্দ। খুদে খুদে কুদনো হস্তাক্ষরে অনেকক্ষণ ধরে হস্তাবরাদ্দ চারখানি চিঠিকে প্রায় আটখানি করে লেখে ও। আর পড়ার ভেতর বাইরে থেকে পাওয়া চিঠিগুলোই নাকি সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয় ওকে। যে দিকে লোক চলাচল সেদিকে পিঠ দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে বার বার চিঠিগুলো পড়ে ও।

তবু অতীশ অশান্ত অতীশই। দুনম্বর বাড়ির ভেতরের বাথরুমটা যাদের ব্যবহার করতে হয়, যেতে হয় অতীশের সীটের পাশ দিয়ে– ওরাই জানে একদণ্ড শান্তি নেই অতীশের মনে। কি দিন কি রাত্রি ওরা দেখে পিঠটা টান করে চেয়ারে ঠায় বসে আছে অতীশ। সুমুখে খোলা বই। পাশে হয়তো একটি খাতা। ডান হাতে কলম। বাঁ হাতটা কপালে। কপালের উপর ঝুঁকে পড়া চুলের গোছাটা অনবরত আঙ্গুলে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে দড়ি পাকাচ্ছে। একই আঙ্গুল দিয়ে সে দড়ির প্যাঁচ খুলছে আবার পাকিয়ে চলেছে। পড়ছে আর মাঝে মাঝে একটি শব্দ বা দু'টি লাইন টুকে রাখছে খাতার পৃষ্ঠায়।

হাসিব বলে, অতীশদা, চুলতো সব টেনে টেনে তুলেই ফেললে। মাথায় যে টাক পড়বে।

কথাটা শুনে চুলে প্যাঁচানো আঙ্গুলের ঘুর্ণীগতিটা হয়ত থেমে যায় কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু হাতটা নেমে আসেনা মাথা ছেড়ে।

অতীশ শান্ত, যেন নীরব ধ্যানে শান্তির বুদ্ধ। কিন্তু অতীশের মনে ধিকি ধিকি অশান্তির আগুন। এক দণ্ড শান্তি নেই অতীশের। তাইতো চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে কপালের আয়তনটা ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলেছে ও।

অশান্তির অন্ত নেই অতীশের। অশান্তি– হরপ্পা মহোনজোদাড়োর বিরাট পুরাকীর্তির যথাযথ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজও অনুপস্থিত, বেলুচিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আজও স্বীকৃত নয় পুরোপুরি। অশান্তি– এতো রক্ত এতো কান্নার পরও মুসলমান কেন হিন্দুর গলা কাটে, হিন্দু কেন মুসলমানের গলা কাটে? অতীশের অশান্তি– উন্মাদ অস্ত্র প্রতিযোগিতা কোন্ বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে চলেছে এ পৃথিবীকে! কতো কারণ অশান্তির– আণবিক বিকীরণ, রাশি রাশি মৃত্যু ভস্ম, বিকলাংগ শিশু, বন্ধ্যা নারী, বীর্য হীন পঙ্গু পুরুষ– সভ্যতার ধ্বংস। অশান্তির অন্ত নেই অতীশের। বই ঘাঁটে আর চুল ছেঁড়ে অতীশ। শুধাই– কী খুঁজছ অতীশ?

জানো, এমন চমৎকার এমন বিস্ময়কর কাব্য কল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যের, অথচ কোথাও তুমি মন ভরে উল্লাস করার মতো একটু উইট পাবেনা, হিউমার পাবেনা। ভাব তো ব্যাপারখানা।

হা কপাল! এ-ও বুঝি এক অশান্তি। মনে মনে বললাম।

অমন যে কালিদাস তার দৌড় কদ্দুর জান? লাডডু মানে নাড় নিয়ে কিছুটা ভাঁড়ামী মাত্র। হরিব্‌ল।

পালি প্রাকৃত সংস্কৃতে অতীশের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। কাজেই এ ব্যাপারে ওর বক্তব্য আমার কাছে প্রামাণ্য। তবু ভয়ে ভয়ে বললাম, আদিরসের সাথে পরিহাসের সূক্ষ্মতা, যাকে তুমি বলছ হিউমার, ওটা বোধ হয় তেমন খাপ খায় না। ঘুরিয়ে বললে– উইট আমদানীর ফলে পৃথিবীর প্রাচীন রস, সেই আদিরসের আবেদনে হয়ত ঘাটতি পড়ত, হয়ত এ কাণেই ও রসটা বাদ দিয়ে গেছেন প্রাচীন কবি নাট্যকার।

বুঝি আমার এমন সহজ অনধিকার চর্চায় বিস্মিত হল অতীশ। বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বলল, ও রকম একটা ঢালাও কথা বলে ফেললে? জান গ্রীক নাটকে উইটের ছড়াছড়ি? এ্যারিষ্টোফেন উইটের রাজা?

নিজের বেঁফাস কথায় নিজেই আটকে পড়েছি। মুখ লুকিয়ে এদিক ওদিক তাকাই।

ভেবে দেখ রামায়ণের মতো একটা বই, গোটা বইখানিতে মাত্র একটি যায়গায় সত্যিকার উইট পাওয়া যায়।

আপন অজ্ঞতার লজ্জাটা ঢাকবার সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি শুধালাম, কোথায়?

রাবণের রাজসভায় যেখানে অঙ্গদের কূট দূতিয়ালী। চমৎকার লোক এই অঙ্গদ। অদ্ভুত সুন্দর রসবোধ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিলাম সেই কবে। অঙ্গদের বক্তৃতার বিন্দুবিসর্গও মনে নেই। তবু বললাম, হুঁ।

আসল কথা কি জান? ভক্তিরসে আমাদের মস্তিষ্কটা এতো তরল যে উইট রসটা দানা বাঁধবার মতো একটুখানি শক্ত যায়গা পেল না কখনো। প্রাচীন বাদ দাও। এস না আধুনিকে। বাংলা, হিন্দি, উর্দু এখনো যেন এই রসটার সন্ধানই পেল না। উইট বলতে এখনো আমাদের সম্বল সেই সবেধন নীলমণি বীরবল। নয়তো সেই স্থূল রসিকতা, গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামি। যাই বল একটা লোক ছিল বটে আকবর বাদশা, বাদশা হলে কি হবে, রসিকতা বুঝবার মতো রসবোধ ছিল লোকটার।

সেদিন এক বছরের কথা বুঝি কয়েক মিনিটে একসাথেই বলে ফেলেছিল অতীশ। বলে ফেলেই হয়ত মনে পড়েছিল ওর, এত কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে? না ঠিক হচ্ছেনা। সহসা চুপ করে গিয়ে সেদিন বুঝি এ কথাটাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল অতীশ।

অশান্ত অতীশ। মাথার চুল ছেঁড়ে আর ভাবে, বাঙ্গালী তথা পাকিস্তান আর ভারতীয়– কবে ওদের মাঝে সত্যিকারের রসবোধ জন্ম নেবে? উইট নেই হিউমার নেই এমন মানুষ তো মৃতের শামিল।

আজ দৃষ্টি আমার থমকে থাকে। এ কী অসম্ভবকে দেখছি চোখের সুমুখে! অতীশ হাসছে। সারা গা দুলিয়ে নিঃশব্দে হেসে চলেছে। হাতে-ধরা একখানা চিঠি। অতীশকে কবে এমন করে হাসতে দেখেছি? মনে পড়ছেনা।

শুধালাম, কিহে অশান্ত অতীশ, আজ যে দেখি বড় প্রশান্ত।

হাসির চোটে মুখ খুলতে পারছেনা অতীশ। ইশারায় ডাকল কাছে।

কাছে এসে শুধালাম খুব যে হাসছ– ব্যাপার কি?

শ্রীমতি বাগদত্তা জবর এক রসিকতা করেছে।

কী রকম? আগ্রহ প্রকাশ করে বসলাম ওর চেয়ারে।

চৌদ্দ বছর ধরে অতীশ আর অশোকা প্রতিশ্রুত। এই চৌদ্দ বছরে প্রতিশ্রুতিটা কেন ফলবতী হল না সে কথা অতীশকে শুধানো আর দেয়ালের সাথে কথা বলায় তফাত নেই বিশেষ। কিন্তু কারাগারের বন্ধুরা যে অশোকার নাম দিয়েছে বাদগত্তা ওতে অসুখী নয় অতীশ। অশোকাকে গেল কয়েক বছর ধরে এ নামেই সম্বোধন করে আসছেও। দু'হপ্তা এদিক ওদিক লিখতে হয়েছিল বলে চিঠি দিতে পারেনি অশোকাকে। সেই খোঁচাটা দিয়ে মন্তব্য করেছে। মনে হচ্ছে ভেতরে বাইরে দু'যায়গাই প্রচুর শেওলা জমেছে তোমার; একটা ঝামা পাঠিয়ে দেব?

অতীশ নিঃশব্দে আর আমি হো হো করে হেসে উঠলাম বললাম, লিখে দাও পাঠিয়ে দিক ঝামা। আমাদের অনেকেরই কাজে আসবে।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে এই কারার আকাশেও কত মেঘ, মেঘে মেঘে কি এক গুমরে-ওঠা কান্না। আকাশটা যেন বিরহিনী বধূর অশ্রু ছলোছলো চোখ। যে কোন মুহূর্তে সে অশ্রু বারিধারায় ভেঙ্গে পড়বে, এ পৃথিবীর গাছপালা ঘরবাড়ী–ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব কিছু। কান্নার তো এমনিই শক্তি।

ওর জানালার ধারে 'মেঘদূত' খুলে বসেছে কালাম, মাঝে মাঝে দু একটি শ্লোক পড়ছে। অধিকাংশ সময়ই কী এক উদাসীন চোখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। আজ বুঝি সব কাজে ওর ছুটি। এ রকম ছুটি বছরে দু চারদিন নিয়ে থাকে ও।

ইচ্ছে হয় ওর পাশে গিয়ে বসি। ওরই মন দিয়ে শুনি কাব্যের ছত্রে ছত্রে বিরহিনী যক্ষ-প্রিয়ার বেদনা। শুনি অলকামুখী পূর্বমেঘে বন্দী প্রিয়তমের কোন্ সে আশ্বাসের বাণী। কিন্তু সারা বছরে পাওয়া এই একটি ছুটির দিনে ওর একান্ত একলা থাকার একান্ত আনন্দটুকুতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করব? সায় দিল না মন। বসে রইলাম।

পাঠে মন বসছেনা মন্টুর, তবু মুখ গুঁজে রয়েছে বইটার উপর। ওকে অসোয়াস্তির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য উঠে পড়লাম। কয়েক পা এগুতেই দেখলাম বইটা বন্ধ করে দুনম্বর বাড়ীর দিকে দৌড়ে চলে গেল মন্টু।

পেথিডিন নিয়ে দিনরাত্রি ক্রমাগত ঘুমিয়ে চলেছেন সেলিমভাই। ডাক্তার বলেছেন ঘুমটাই এ রোগের সেরা দাওয়াই। এখনো ঘুমুচ্ছেন সেলিম-ভাই আর তাই কাসেম ডিউটি মুক্ত। কাজ না থাকলেই কাসেম যা করে তাই করছে। মাথাটা একেবারে গরাদের লাগ বালিশে রেখে বিছানায় চিৎ হয়ে পা দোলাচ্ছে। খোলা গরাদ দিয়ে চোখ ওর নিবদ্ধ দূর আকাশের দিকে। আর গান গাইছে। 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে'।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে মাথাটা তুলে একবার দেখলো ও। অল্প প্রত্যুত্তরে ফকির ভাই কি পেছনে তাকালেন? এমন সময় কেউ কি পেছনে তাকায়! কোন দিকে চোখ না ফেলে জমাদারের পিছু পিছু সিদা চলে গেলেন ফকির ভাই। মন তার আরো আগেই চলে গেছে বাইরে।

আর যারা রইল পিছনে; নির্মিমিখ চেয়ে রইল ফকির ভাইর মাড়িয়ে যাওয়া পথটার দিকে।

অমাবস্যা রাত। কিন্তু গুমটি ঘরের ফ্ল্যাশলাইট ভেতর গেইটের পথটাকে দিনের মতোই আলোকিত করে রেখেছে। সে পথ জনশূন্য। তবু চেয়ে থাকি।

এই মুহূর্তে কেন যেন মনে পড়ে গেল স্নেহ-বিধুর একখানি জননী মুখ। ঘরে ঘরে এমনি কতশত জননী বন্দী সন্তানের মুক্তি কামনায় আকাশের দিকে নিষ্ফল প্রার্থনার হাত তুলে বুক ভাসিয়ে চলেছে চোখের জলে সে হিসেব কি কেউ করবে কোন দিন?

কারাফাটকের ঘন্টাটা বারোটা পিটিয়ে আবার প্রথম থেকে পালা শুরু করেছে। গ-দা নাক ডাকছেন। অ-দা দাঁত মাজছেন। অন্যরা জেগে। ওরা জানে মুক্তি দুরাশা। তবু সেই দুরাশার আশাই কি ওদের আজকে রাতের ঘুমটা কেড়ে নিল?

যাক, বাঁচা গেল। হাসিব যেন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাকিয়ে দেখি গভীর এক পরিতৃপ্তির চোখে অনুপস্থিত ফকিরভাইর উপস্থিত ফ্যানটার দিকেই চেয়ে রয়েছে ও।

বললাম, চলে এসোনা পাখার নীচে!

কথাটা আমার গায়ে মাখলনা হাসিব। কালামকে উদ্দেশ্য করে বলল সকালে উঠেই অফিসে স্লিপ দেবে কালাম ভাই। ফ্যানটা যেন শীগগীর খুলে নিয়ে যায়।

কেন, ওটা থাকলে কি তোর ঘুম হবেনা? কৌতুক হেসে শুধাল কালাম। ঠিক তাই। বলেই লম্বা হল হাসিব।

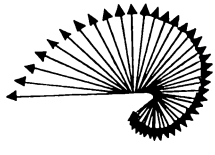

সাতুই আষাঢ়

আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও, ধুইয়ে দাও--------।

হঠাৎ গানটা থামিয়ে হন্তদন্ত হয়ে মুরাদের সীটের দিকে ছুটে গেল কাসেম। খবর কাগজের অবরোধ থেকে ওকে বের করে বলল, কই তোমার সহিহাদিসটা একটু বের কর তো।

কেন? কাজে ব্যাঘাত পেয়ে বিরক্ত হয়েই শুধাল মুরাদ।

ইরানের তৈল কনর্সোসিয়ামে আমেরিকার শেয়ারটা কতো? ভুলে গেছি হিসেবটা।

মুরাদের টেবিলটা তিনতলা। বই পত্রিকায় সব কটি তলাই ঠাঁসা। দোতলা থেকে একটা ঢাউশ গোছের খাতা বের করে কাসেমের দিকে বাড়িয়ে দিল মুরাদ। বলল তিন শো সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় আছে, দেখে নাও।

নিজের সিটে ফিরে এসে খাতার ভেতর ডুবে গেল কাসেম। এমনিই স্বভাব কাসেমের। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এমনি নানা নীতি ওর মগজের ভেতর গিজ গিজ করে সারাক্ষণ। এতো নীতির এতো পোকা মগজময় গিজ গিজ করে এর মাঝে সেখানে কেমন করে ঠাঁই পায় গান। এ প্রশ্নটা অনেক দিন ভেবেছি। ভাবতে ভাবতেই আমার মনে পড়েছে মনীষীদের কথা, পৃথিবীর খ্যাতিমান চিন্তাবিদদের কথা। দুরূহ এবং জটিল কোন সমস্যা ভাবতে গিয়ে কেউ পিঠের উপর হাতের কাচি বানিয়ে পায়চারি করেন ঘন ঘন, কেউ টেবিলের উপর নখ ঘসেন, কেউ কলম হাতে অনবরত আঁচড় কেটে চলেন কাগজে, কেউ বা টেনে টেনে চুল ছেঁড়েন। কাসেমের গানটাও হয়ত এমনি একটা 'মুদ্রা'। মুদ্রা দোষ নয়, যেমন থাকে নাচের মুদ্রা, এও তেমনি একটা চিন্তার মুদ্রা। গান গাইতে গাইতে ও ডুবে যায় গভীর চিন্তায়, অথবা চিন্তা করতে করতে গান ধরে। সীট থেকেই চিল্লিয়ে উঠলাম- কই কাসেম, পয়লা লাইনটা গেয়েই যে থেমে গেলে। পুরো গানটাই হোক না।

সহি-হাদিস থেকে মুখ তুলে আমাকে দেখল কাসেম। যেমন হাসে তেমনি ফুক করে বার দুই হাসল, যেন বলল, কেন আর লজ্জা দিচ্ছ।

রশিদ এক পাশে বসে কালামের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে একটার পর একটা। কালামের হাতে কি একটা ইংরেজী কবিতার বই। বইটা বন্ধ করে একটুক্ষণ বুঝি ভাবল কালাম। বলল মহাকাব্যের সবচেয়ে বড় কথা হল তার ব্যাকগ্রাউণ্ড, পটভূমি। ইলিয়ড অডিসি মেঘনাদবধ প্যারাডাইস লষ্ট এ সব মহাকাব্যের পটভূমিগুলো বিশ্লেষণ কর। দেখবে, কালের আবর্তিত ধারায় বিপুলা জীবনের প্রবাহ এসব কাব্যের পটভূমি। এর ছত্র ছত্রে উচ্ছ্বাসিত যুগ সন্ধির বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা। মহাকাব্য মূলতঃ যুগান্তরের, মানবেতিহাসে নবমূল্যায়নের মহাসনদ। এই অর্থে মহাশ্মশান কাব্য ব্যর্থ। দেখছ না, সকল বাংলাভাষির কথা বাদ দাও, কজন মুসলমান এ কাব্য পড়েছে? পড়ে না। কেননা এর মাঝে নতুন কিছু নেই; নতুন কিছু পায় না ওরা।

শক্ত ভাষায় রীতিমতো একখানি বক্তৃতা দিয়ে থামল কালাম। মন্টুর মুখের উপর নজরটা ধরে রাখল, বুঝি জানতে চাইল বিষয়টা বোধগম্য হল কিনা ওর। এমন সময়----

অফিস কল জমাদার এসে হাঁক ছাঁড়লো।

কার? কার? একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল যারা কোরান পড়ছিল তারা আর যারা সাহিত্য আলোচনা করছিল তারাও। জমাদার এগিয়ে গেল মন্টুর দিকে। অফিসে মন্টুরই ডাক পড়েছে।

কেন? শুধাল কালাম।

আই বি উবি হোবে গা। উর্দুটাকে বাংলা করে বলল জমাদার।

কোয়াটার্লির সময়ে হয়ে গেছে। বলতে বলতে সীটের দিকে উঠে গেল মন্টু। জামাটা পাল্টিয়ে রেডি হল যাবার জন্য।

কারাগারে বরাদ্দকৃত দু'ছটা রুটি আর আট ছটাক চালের মতো আই বি সাক্ষাৎটাও নির্দিষ্ট বরাদ্দ। প্রতি তিনমাসে আই বি অফিসার আসে। কখনো শুধু কুশলবার্তা শুধিয়েই চলে যায়। কখনো বা একটু খুঁচিয়ে, সামান্য একটু ইঙ্গিত ছেড়ে আবার আসবে বলে বিদায় নেয়।

পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। কুড়ি মিনিট কেটে যায়। তারপর এক ঘন্টা। তবু, মন্টু ফিরে আসে না। কি হল? এতক্ষণ আই বি ইন্টারভিউ তো হয়না কখনো? পারিবারিক সাক্ষাৎও নয়। কেননা ও জন্য রয়েছে বাঁধা সময়, বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা।

মন্টু আর ফিরে এল না।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর সেই জমাদারই ফিরে এলো। মন্টুর বিছানাপত্র নিয়ে গেল। মন্টুকে বদলী করা হয়েছে রাজশাহী জেলে।

কারাগারের এ এক নির্মম পরিহাস। নির্মম হলেও এটাই নিয়ম। বদলীর খবরটা পাঁচ মিনিট আগেও জানতে পারে না মন্টু। আগে ভাগে জেনে নিয়ে যদি ঘটিয়ে দেয় কোন 'রাষ্ট্র বিপ্লব'? মন্টু যে রাজবন্দী, "রাষ্ট্র বিরোধী"। মারাত্মক অপরাধী। ওর মতো বিপজ্জনক লোকগুলো কখন কী করে বসে তার ঠিক কি? বুঝি সেজন্যই এ সতর্কতা।

মেজাজগুলো সব চচ্চড় করে চড়ে গেল সপ্তমে। নেহাৎ কালাম সুমুখে, নইলে খলিল বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ত জমাদারের উপর। নিজেকে যথেষ্ট সংযত করেও জমাদারের নাকের উপর আংগুল নাচিয়ে নাচিয়ে যা বলল তার সংক্ষিপ্তসার– আপনারা কি মানুষ না জানোয়ার? হৃদয় বলে কিছুই কি নেই আপনাদের? সেখানে কি পাথর ঠেসে বসে আছেন? ছেলেটাকে যে পাঠিয়ে দিলেন রাজশাহী, দেড়মাস বাদে তো তার পরীক্ষা। ও পরীক্ষা দেবে কেমন করে? দাঁড়ান, চুপচাপ ভদ্রলোকের মতো থাকি তো তাই বাড় আপনাদের বেড়ে গেছে বড়। ইত্যাদি ইত্যাদি!

মান্নান আর এক ধাপ উঁচুতে। যান যান, ওর জিনিষ যাবে না! ওকে নিয়ে আসুন। ইয়ার্কির আর যায়গা পান না!

করজোড়ে তেমনি বাংলা করা উর্দুতে মাফ চাইল জমাদার। দেখিয়ে দেখিয়ে সাব, আমরা হোলাম হুকুম কা চাকর। যা হুকুম তাই তামিল। পেট কা নোকর আমাদের নোকরী খাবেন?

নিরুপায় আক্রোশে ফোঁস ফোঁস গর্জায় খলিল আর মান্নান। হাসিব দূরে দূরে। ও জানে ক্রোধ সামলে রাখবার ক্ষমতা নেই ওর। ক্রুদ্ধ রাগটাকে তাই আপনার ভেতরে পুরে আহত পশুর মতো ছটফটিয়ে ফিরছে ও-বাড়ীর বারান্দায়।

শুধু কোন চাঞ্চল্য নেই মন্টুর পায়রাটার। তেমনি শার্সির খোপে বসে চেয়ে আছে নির্বিকার। ও কি জানে, মন্টু যে চলে গেল?

পাচিল ঘেরা এক-দু নম্বর বাড়ী। একটি মাত্র দরজা। কাঠের তৈরী ছোট্ট এক দরজা দিয়েই আসা যাওয়া। অফিসের সাথে যোগাযোগের এই একটি মাত্র পথ। দিনভর বাইর থেকে আটক থাকে হুড়কো, শুধুমাত্র দরকারের সময় খোলা,

অন্য সময় বন্ধ রাখা। শুধু এ কাজের জন্যই দরজার বাইরে মোতায়েন পৃথক এক পাহারা। কে বা কারা সে দরজায় ফুটো করে রেখেছে একটা। এক ইঞ্চির দুভাগের একভাগ হবে ফুটোটার বেড়। কবে এই ফুটোটার জন্ম জানি না। শুধু মনে আছে চৌদ্দ বছর আগেও ফুটোটা দেখেছিলাম এ দরজায়। ফুটোটা তখন বিন্দুর মতোই ছোট্ট ছিল। তারপর চুয়ান্ন সালে এক দঙ্গল মেয়ে এসেছিল এখানে। ওরা নাকি পেন্সিলকাটা চাকু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোয়ার্টার ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়েছিল ফুটোটার পরিধি।

ওই টুকু ফুটোর মুখে বুঝি হুড়মুড় খেয়ে পড়ল চব্বিশজন মানুষ। ফুটো দিয়ে দেখা যায় অদূরে জেল অফিসের উত্তর দিকের একখানি জানালা। মন্টু এসে দাঁড়িয়েছে জানালায়।

একে একে সবাই এক নজর দেখে নিল। ফালতুরাও দেখল। সবার শেষে আমি। ফুটোটার মুখে ঠোঁটজোড়া চেপে চেঁচিয়ে বললাম, মন্টু আবার দেখা হবে।

আমার কণ্ঠস্বরটা অদূরে পৌঁছুল কিনা জানিনা। দেখলাম হাত নেড়ে বিদায় নিল মন্টু। ম্লান মুখটাকে ম্লানতর করে একটু হাসল। ও।

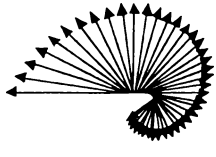

আটাশে ভাদ্র

বন্দী জীবনের মধুরতম লগ্ন। মুক্তির ডাক। অকস্মাৎ এসে গেছে মধুরতম সেই মুক্তির ডাক।

ফকিরভাই মুক্তি পেলেন। সেই সাথে হাসিব যাকে বলে ওর চেলা, সেই চেলাটাও।

দুর্নিবার মুক্ত পৃথিবীর আকর্ষণ। প্রতীক্ষমানা বধূর অশ্রুভরা চোখ, আপনজনের মিষ্টি ডাক, শিশুর হাসি– বুকের ভেতর ব্যথার মোচড় দিয়ে দিয়ে জেগে ওঠে। অশ্রুভরা সেই চোখ, প্রেয়সীর সেই সিক্ত হাসি, নিত্য-প্রহর শুধু ডাক দিয়ে যায়, এসো ফিরে এসো আমাদের মাঝে, এ নীড়ের আশ্রয়ে। বন্দীর প্রাণ কেমন করে অস্বীকার করবে প্রিয় পৃথিবীর এই দিনরাত্রির আহ্বান?

কিন্তু যাদের নেই নিভৃত কোন গৃহকোণ যাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই কেউ? যাদের জন্য ঝরে না প্রেয়সীর একফোঁটা অশ্রু? ওদের বুকে বাজে প্রান্তরের ডাক। দিগন্ত অসীম ওদের দেয় হাতছানি, বলে অবরোধের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এসো আমার উদার বক্ষে। এসো ধূলির শয্যায়।

মুক্তির নির্দেশনামাটা পৌঁছেছে রাত নটা কি সাড়ে নয়টায়। আমরা জানলাম রাত দশটায় জমাদার যখন লক আপ খুলে বলল, চ-লিয়ে। বুঝতে ভুল হলনা, এ ডাক মুক্তির ডাক।

তবু চার দেয়ালের বন্ধনে বাইরের ডাক, সহসা যেন বিশ্বাস হতে চায়না ধড়াক করে লাফিয়ে ওঠে প্রাণগুলো আর জমাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে জোড়া জোড়া নিষ্পলক চাহনি।

বিদায় দেবার এবং নেবার, কারো সাথে হাত মেলাবার মতো মনের অবস্থা নয় ফকিরভাইর। বাইরের পৃথিবী ছায়া ফেলেছে তার চোখে। কালাম মন্টু হাত লাগিয়ে মিনিট দশকের মধ্যেই জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে দিল। রাত দশটা বারো মিনিটে বেরিয়ে গেলেন ফকির ভাই।

খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ। পেছন থেকে শুভকামনা জানাল কালাম বনুমামা, সবাই।

কিন্তু হৈমন্তী দিনের উৎসব-অংগনে আমার ঠাঁই কোথায়? বন্দী প্রাণে খুঁজে পাইনা এই আনন্দ মেলার আমন্ত্রণ। এমন সোনা ঝলোমেলো সকাল, শিউলী তলায় ফুলের বিছানা, ফুলের বনে হলুদ পাখী প্রজাপতির চঞ্চল নৃত্য– সব মিলিয়ে কী এক বেদনা। যেন বিষাক্ত দংশনের অসহ্য যন্ত্রণা।

শুধু কি যন্ত্রণা? একটি যন্ত্রণার আয়ু, সে আর কতক্ষণ? তীব্রতার শিখরে উঠেই সকল যন্ত্রণার শেষ, কেননা সংজ্ঞা তখন লুপ্ত। না, এ কোন বেদনা নয়, এ এক বিড়ম্বনা। শিখরে ওঠা যন্ত্রণার মতো যার সহজ কোন উপশম নেই। এ বিড়ম্বনা অধিকার লংঘনের। অপরাধ বোধের। আজিকার এই আনন্দ বরণের মহামেলায় কোন অধিকার নেই আমার। আমি ব্রাত্য আমি অধিকারচ্যুত আমি বন্দী। বন্দী হিয়ায় আনন্দ পরশ আনন্দগান পাপ। ফুলের শয্যা তাই আমার যন্ত্রণা। হৈমন্তী সকালে তাই গুমরে ফেরা কোন কান্নার রেশ।

কালাম শোন্ শোন্। আমার কি হল আবার?

আমার এজাতীয় কথাবার্তায় বুঝি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে কালাম। এক পলক আমার মুখটা দেখে বলল কিছু হয়নি, চল্, ঘরে যাই।

কিন্তু আনন্দ কেন স্পর্শ করে না আমায়? ফুলের বনে প্রজাপতির মধু-সন্ধানে আমি দেখি বেদনা, শুধুই বেদনা। কেন এমন হয়?

ও কিছু নয়, চল।

না না কালাম! তুই যা ভাবছিস তা মোটেই সত্য নয়।

কী ভাবছি আমি?

ভাবছিস আমি বুঝি মানসিক ধৈর্য হারাচ্ছি। সেলিমভাইর মতো পাগল হতে চলেছি। তাই সান্ত্বনা দিচ্ছিস।

এ তোরই কল্পনা। আমি এসব কিছুই ভাবিনা। আয় ঘরে আয় তাস খেলব।

না। তাস আমার ভাল লাগে না।

তবে দাবা হোক এক হাত?

না, দাবাও না। বললাম না তোকে কোন আনন্দই আমাকে আকর্ষণ করে না?

এ জন্যই তো আমার ভয় হয় কালাম– প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, আনন্দ, জীবন থেকে এ সব কিছু ছেঁটে ফেলে আমি যেন উদ্ধত আর বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইছি। আমি অস্বীকার করতে চাইছি সমস্ত সৌন্দর্য আবেগকে, সে আমার নয়। কিন্তু সে তো পারবিনে তুই। পারবিনে বলেই তো হৃদয় জুড়ে তোর এত কল্পনা তাই কি?

ছয়ই আশ্বিন

ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আ-মানু,----- খাজা কামালুদ্দীনের ইংরেজী অনুবাদ আর আরবী কোরান নিয়ে বসেছেন আবিদ সাহেব। তাঁকে ঘিরে হাজি সাহেব খলিল, মান্নান। ওরা কোরান পড়ছে।

গম্ভীর মুখে বসে আছেন গ-দা। মাঝে মাঝে আড়চোখের অভিমানী দৃষ্টিটা থেমে থাকছে মান্নানের পিঠের উপর। গ-দার বেড়ালগুলো আবার মার খেয়েছে মান্নানের হাতে।

বলি ওদের শরীরটা কি রক্ত মাংসের নয়? ওরা ব্যথা পায় না? ওদের কষ্ট হয় না? আমাকে সামনে পেয়েই ফেটে পড়ল গ-দার রুদ্ধ অভিমান।

টেলকুটাকে প্রায় খুন করে ফেলেছে। দেখ না, পা-টা কেমন ফুলে উঠেছে? ইস্, মাসুম পশু তায় আবার পালা পুষি, মার খেয়েও পালায় না, পালাতে জানেনা– ওদের এমন করে মারতে হয়?

শুনতে পেলে হয়ত কোরান ছেড়েই তেড়ে আসবে মান্নান, তাই স্বরটাকে খুব নীচু করেই হামদরদী জানালাম গ-দাকে। বললাম, এ বড়ো অন্যায় মান্নানের।

এই আমি বলে রাখছি শুনে নাও। ওই শুয়োরটা বেড়াল মেরে হাত পাকাল তো? এরপর নির্ঘাত মানুষ খুন করবে।

মান্নান শুনলো কথাটা। কিন্তু কোরানের ভেতর ডুবে থাকার জন্যই হোক অথবা সুবিবেচনার জন্যই হোক, প্রতিবাদ করলনা।

গুয়ালাস লোশন এসে গেছে হাসপাতাল থেকে। বেলকুকে কোলে তুলে নিলেন গ-দা। লোশনে রুমাল ভিজিয়ে বেঁধে দিলেন ওর ফোলা পায়ে আচ্ছা বললাম ভাই, কায়কোবাদ মহাকাব্য লিখেও মহাকবির খ্যাতি নেলেন না কেন? প্রশ্নটা মন্টুর। কলামের সীটে বসে সাহিত্য আলোচনা করছে ওরা। খলিল একবার বলেছিল বিছানাপত্র নিয়ে এ খাটেই চলে আসবে ও মন্টুর খাটে শোয়াও হবে, আমার পাশেও আসা হবে। কিন্তু কী মনে করে আর আসেনি।

ওর আপার দেয়া ফুলদানিটা রেখে গেছে মন্টু। ওর টেবিলে যেমন করে রাখতো ও তেমনি রাখা আছে ওটা। বুকে তার গুচ্ছভরা রজনীগন্ধার সবুজ

ডাটি। শুধু উপহার বলে নয়, কাঠের উপর কাশ্মীরি কারিগরের কারু-বিন্যাসে চমৎকার দর্শনীয় বস্তু, তাই ফুলদানিটা বিশেষ ভাবে প্রিয় ছিল মন্টুর। এ নিয়ে রশিদ আর খলিল ক্ষেপাত ওকে। ওরা ওর কাছে উপহার চাইত ফুলদানিটা। কী জবাব দেবে ভেবে পেত না মন্টু। সরাসরি না করতে বুঝি বাধত ওর ভদ্রতায়। ওকে চুপ দেখে আরো টালিয়ে চলত খলিল। বলত– মন্টু,দা কেমন মানুষ তুমি! দেশ হিতে সব ছাড়লে আর সামান্য একটা ফুলদানির মায়া ছাড়তে পারছনা?

তাচ্ছিল্য ভরে মুখ বেঁকাতো রশিদ, ছিঃ এমন তুমি?

কোন কিছু বলতে না পেরে পালাবারও পথ না পেয়ে বসে বসে ঘামিয়ে একাকার হত মন্টু। ওর এই লজ্জিত কুণ্ঠিত করুণ অবস্থাটা দেখে কৌতুক পেতাম, খলিলদের সাথে যোগ দিয়ে আমিও বলতাম, দেখ মন্টু আমি লোকটা কিন্তু একেবারে নির্লোভ নই। তুমি দিলে নিতে আপত্তি থাকবে না আমার। মন্টুর মুখটা তখন ভাজা বেগুনের মতো।

সেই ফুলদানিটা রেখে গেছে মন্টু। ওর সব জিনিষের সাথে ওটাও অফিসে গেছিল। কিন্তু মন্টু ফেরত দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, খলিল যেন রাখে। না রাখলে দুঃখ পাবে মন্টু।

বিদায়ের লগ্নে বন্ধুদের জন্য স্মৃতি হিসেবে প্রিয়তম জিনিষটাই রেখে গেছে ও।

রাত গড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! মেঘগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন আঠার মতো শক্ত হয়ে সেটে রয়েছে আকাশের সাথে। নাঃ, আমার প্রিয় তারকাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না আজ।

তবু চেয়ে থাকি মেঘে ঢাকা রাত্রির অস্পষ্ট আকাশটার দিকে। যেন এমনি পলকহীন চোখে চেয়ে থাকলেই মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে তারার দল; তারার হাসিতে, তারার আলোয় ঝরে পড়বে স্নিগ্ধতার ধারা। সে ধারার অমৃত পরশে বন্দী ভুলবে লৌহগারদে এই বিনিদ্র রাত্রির বেদনা।

কয়েদির রাত্রি গড়িয়ে চলেছে শেষ পহরের দিকে। ঝিমিয়ে এসেছে। গুমটি ঘরের সন্ধানী বাতি।

খলিল চোখে মুখে পনি ছিঁটিয়ে এল। এ নিয়ে তিনবার। বেচারির বুঝি একরাত্তি ঘুম হলনা আজ। রাত তো প্রায় কাবার। কখন আর ঘুমুবে!

ক'বারই ভেবেছি উঠে যাই, বসি ওর চেয়ারে। কিন্তু বন্ধুদের উপস্থিতিটাই এই নিদ্রাহীন রাতের অস্থির নির্জনতায় হয়ত অযাচিত, হয়ত বিরক্তিকর বলেই মনে হবে ওর কাছে। তাই নীরবে শুধু লক্ষ্য করেছি বুকের ভেতর অবরুদ্ধ কোন অশান্তিতে ছটফট করছে ও সেই প্রথম পহর থেকে।

চার মাস বাদ গেল বিকেলে তাহ্‌মিনার চিঠি পেয়েছে খলিল। সে চিঠিই বুঝি ওর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এতদিন পর চিঠি এলো তাহ্‌মিনার। কী লিখেছে কে জানে।

নিঃশব্দে কাছে এসে বসলাম, শুধালাম– লুমিনল খাওনি।

ফেনোবারবিটন খেয়েছি দুটো। কিন্তু কিচ্ছু হলনা। মাথার ভেতর যেন ঝাক ঝাক ঝিঁঝিঁ পোক বাসা বেঁধেছে।

মাথা ধুয়েছ?

না, ধুয়েও লাভ নেই। ঘুম আর হবেনা আজ। একটা সিগারেট ধরালো খলিল।

ধুমাপানে আসক্ত নই। তবু ইচ্ছে জাগল। চেয়ে নিলাম একটি শলা। ওর মুখ থেকেই আগুন নিলাম।

কিন্তু আপনি, আপনি কেন ঘুমুচ্ছেন না হামেদ ভাই? সিগারেটে একটা অতি বিরক্তিকর টান দিয়ে শুধাল খলিল।

রহস্য করে বললাম, আমার কথা বাদ দাও। আমি তো তুরীয় বিচরণে বুঁদ হয়ে থাকি। ঘুম হলেই বা কী আর না হলেই বা কী। যা অনিদ্রা তাই আমার নিদ্রা। শেষ রাতের নিভু নিভু তারার মতোই ম্লান করে একবার হাসল খলিল বলল, আমার কিন্তু ঘুম না হলে খুবই খারাপ লাগে।

খু-ব-ই স্বাভাবিক।

ওরই শব্দটার উপর জোর দেয়াতে বুঝি কিছু কৌতুকের রস পেল ও। গলাটাকে ছেলেমানুষের মতো করে বলল, হামেদ ভাই আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

খু-উ-ব?

হ্যাঁ। বলে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল খলিল। এই সুযোগ। অলক্ষ্যেই নেবে যাচ্ছে ওর মনের ভার। এখুনি কথাটা পাড়তে হবে। শুধালাম কী হয়েছে বল তো?

মুহূর্তেই নিভে গেল খলিল। গম্ভীর মুখটা সরিয়ে নিল বাইরের দিকে। মাথার উপরে ধিমি আলো। সে আলোতেও আমি যেন দেখলাম, চোখের খেতে ওর কী এক বেদনা দাপিয়ে মরছে প্রকাশের তাড়নায়। বুঝতে কষ্ট হয় না, কিসের এ বেদনা!

বুঝলাম এখন কিছুই বলবেনা খলিল। তাই যে কথাটা গত দেড় মাস ধরেই বলব বলব করছি কিন্তু বলা হয়নি, সে কথাটাই বলে ফেললাম। বললাম, এভাবে একজনকে কষ্ট দেয়ার আর কষ্ট পাওয়ার কী মানে হয় খলিল? একে তো আটক জীবন। তার উপর মনকে যদি এতটা আঘাত হান তাহলে শরীর মন দুই-ই যে ভেঙ্গে পড়বে। তাহ্‌মিনা খুব ভাল মেয়ে। ওকে তুমি আসতে লিখে দাও। লিখে দাও এসে যেন দেখা করে তোমার সাথে। কিচ্ছু না বলে শুধু আমার হাতটা আপন মুঠোয় টেনে নিল খলিল। যেন আশ্বাস খুঁজছে, সান্ত্বনা চাইছে, তেমনি ভাবে মুঠিটা চেপে রাখলো। বসে রইলাম। শেষ পহরটাও বুঝি কেটে গেল এমনি নিঃশব্দে।

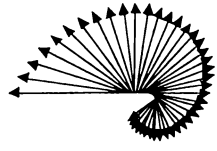

দশই অঘ্রান

হেমন্তে শিশির।

ঘাসের ডগায় শিশির ফোঁটা। শিশির নয়, যেন ঘাস চোখ। স্বচ্ছ দৃষ্টি টলটলে চোখ।

মানুষের চোখ অমন হয়? কোন মেয়ের? ঘাসের ডগায় এক ফোঁটা শিশিরের মতো স্নিগ্ধ কোমল টলটলে চোখ। হয়তো আছে এমন চোখ, আমি এখনো দেখিনি। কিন্তু হেমন্ত শিশিরে কিসের আভাস? আসন্ন কোন কান্নার? অঘ্রাণ মাসের পুরো দিনটাই যেন কান্নার গুমোট।

আর হেমন্ত রোদ। কেমন ম্লান মুখ করে আসে আর ত্রস্তে ডিঙ্গিয়ে যায় বন্দীনিবাসের এই ক্ষুদ্র আঙ্গিনা। রোদটাও কি ভয় পায়? দয়াহীন, বন্ধুহীন মায়াহীন এই দেয়াল ঘেরা পৃথিবীটাকে না ভয় পায়? রোদেরও ভয় আছে। ভয় পায় বলেই প্রাচীরের ওপার দিয়েই কেমন চুপি-চুপি হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায়। এ পারে দেয়াল-রুদ্ধ আলোর পিপাসু মানুষ গুলোর বুভুক্ষ–দৃষ্টি উপোসে মরে।

আপনজনের গাঢ় মমত্বভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকত সেই যে নীলফুল, একে একে ঝরে যাচ্ছে ওরা। শুকিয়ে আসছে অপরাজিতার লতা।

কোন ফুল নেই বাগানে। পুষ্পহীন গোলাপ ঝাড়। কসমসেরচারা গজাচ্ছে সবে। সর্যমুখীর চারা সবে মুঠ-হাত। চন্দ্রমল্লিকার কুড়িরা মোটে কোরক বেঁধেছে। ফোটার আগে আরো অনেক শিশির চাই চন্দ্রমল্লিকার।

কিন্তু এমন তো হবার কথা নয় হেমন্ত ঋতুর। অঘ্রানে বাংলার ঘরে ঘরে ফসলের আঘ্রান, হৈমন্তী ধানের প্রাণমাতানো সুবাস, মাঠে মাঠে সোনালী শিষের আনত চুম্বন। কিষান বধূর বুকের আশা চোখের স্বপ্নে যে পৌষ– অঘ্রান তো তারই পূর্বরাগ।

আশ্চর্য! এ সব কথা যেন কাষ্ট করে স্মরণ করতে হয়, স্মৃতি থেকে আতিপাতি খুঁজে খুঁজে তুলে আনতে হয়।

ঘাবড়িয়োনা দোস্ত। বাপের নামটাও ভুলিয়ে দেবে। কাসেমের সেদিন কার উক্তিটাই মনে পড়ে গেল।

প্রতিদিনের মতো জার্নাল আর পত্রিকার উপর ঘাড় গুঁজে ছিল মুরাদ। কাসেমকে সুমুখ দিয়ে যেতে দেখে হঠাৎ ঘাড় তুলে শুধিয়ে ছিল, হ্যাঁরে কাসেম, আর কদ্দিন থাকতে হবে জেলে? আমাদের ছাড়েনা কেন?

থমকে দাঁড়িয়েছিল কাসেম। তার পরই উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে অনেক কিছুই বলেছিল যার শেষ কথাটা, ঘাবড়াও মৎ দোস্ত, বাপের নাম ভুলিয়ে তবে ছাড়বে।

তা বলে হেমন্তের সম্ভারে সোহাগে অপরূপ যে অবারিত মাঠ এ দেশের, যেখানে আমার জন্ম, যে ঋতু এ পৃথিবীতে আমার আগমনের প্রথম সাক্ষী তার কথাও ভুলিয়ে দেবে আমায়? ঠাট্টা করে বললেও কাসেমের কথাটাই বুঝি ঠিক। লৌহকারার রুদ্ধ বাতাসে শুকিয়ে গেছে কতো মুখের হাসি হারিয়ে গেছে কত প্রাণের সুষমা। কারাগার কেড়ে নিয়েছে মায়ের স্নেহ, বধুর ভালবাসা, কেড়ে নিয়েছে জীবন। আর আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে আমার স্মৃতি, অন্তরকোনে লুকিয়ে রাখা সেই অবারিত মাঠের ছবি, এ আর আশ্চর্য কী!

হেমন্ত এখানে নিরানন্দের ঋতু। হেমন্ত শিশিরে ঘসের চোখে যেন থমকে থাকা কান্না। কেউ কি বলতে পারে কীসের কান্না?

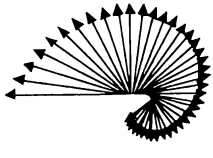

পয়লা পৌষ

পৌষ প্রভাতে এমন আনন্দ বুঝি আর আসেনি কখনো।

দুবাড়ির সব কটি মানুষ এক সঙ্গেই হৈ চৈ করে উঠল, মেতে উঠল অপ্রত্যাশিত এক আনন্দের উৎফুল্লতায়।

জামসেদ আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। তাই এত আনন্দ।

এক বছর আগে দুবছর সশ্রম কয়েদ তিন হাজার টাকা জরিমানা আর দশ বেত দণ্ড নিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছিল জামসেদ। প্রথম আপিল ওর নাকচ হয়েছিল। দ্বিতীয় আপিলে জরিমানাটা মাপ হয়েছে পুরোপুরি, দণ্ডকাল হয়েছে অর্ধেক, বেতের সংখ্য অপরিবর্তিত। গতকাল বিকেলে পুরো একবছর দণ্ডভোগের শেষ দিনে ও জানতে পেরেছে আপিলের ফলটা। আরো জানতে পেরেছে নিবর্তন আটকের পূর্বতন আদেশ, যা দণ্ডভোগ কালীন রহিত ছিল সেই আদেশটাও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কার্য্যকরী হয়েছে। অর্থাৎ সাজা খাটা সারা হলেও রাজবন্দী সে রয়েই গেছে। তাই সকাল হবার সাথে সাথেই পুরানো আস্তানায় ফিরে এসেছে ও।

কিন্তু আমি সামিল হতে পারিনা ওদের আনন্দে। ওদের কলকণ্ঠতানে সুর মেলেনা আমার। অরন্তুদ এক বেদনায় রুদ্ধ হয়ে আসে আমার কণ্ঠ।

আমার মনটা চলে যায় পেছন দিকে। আমার মনে পড়ে সে দিনটির কথা। সে দিনটির কথা আমি ভুলতে পারিনি। কখনো ভুলতে পারবো না।

সে দিনটি মূর্তিমান এক নৃশংসতার মতই ভেসে ওঠে আমার চোখের সুমুখে।

জেলখানার কেসটেবিল। অর্থাৎ কারাপালের এজলাস। কারাগারের অভ্যন্তরে যত নালিশ এখানে তারই বিচার। কেসটেবিলের সুমুখে উদলা মাঠ। মাঠে আজ কালো রং-করা ইস্পাতের সেই বিকট যন্ত্র যার উপর চোখ পড়লে অজানতেই দুরুদুরু কেঁপে ওঠে বুকটা। জেল পরিভাষায় এর নাম টিকটিকি।

হাতলবিহীন একটা লোহার খাটিয়াকে লম্বালম্বি দাড় করিয়ে ঈষৎ পেছনে ঠেস দিয়ে রাখলে যেমনটি দেখায় টিকটিকির বাহ্যিক চেহারা অনেকটা সেরকম।

তফাত, টিকটিকির মাঝখানটা সুমধ্যমার কটিদেশের মতই ক্ষীণ আর মাথা এবং পায়ের দিকে দুপাশে দুটো লম্বিত লোহার পাত। শক্ত পাত, চ্যাপ্টা এবং পুরু। উপরে এবং নীচে এই পাতগুলোর প্রান্তে দুটো করে চারটে আংটা লোহার খাড়ুর মত মোটা এবং মজবুত।

কালো বার্নিশে রোদ পড়ে ঝক ঝক করছে টিকটিকির ইস্পাত দেহটা। এটাই ওর স্বভাব। কারাগারে যে দিন অন্ধকার নামে সেদিন এমনিই বার্নিশ মেখে ঝকঝকিয়ে ওঠে ইস্পাতের এই কুৎসিত আকৃতিটা।

জল্লাদ আজ সকাল থেকেই মহড়া দিয়ে চলেছে। টিকটিকির ওপর একটা বালিশ বেঁধে তারই উপর ওর যত গায়ের জোর আর পৈশাচিকতার মহড়া চলছে। শুধু মহড়াতেই গোটা বার সিঙ্গাপুরী বেত ভেংগে ফেলেছে ও। আসল সময় না জানি আজ কতোটি বেত ভাঙ্গবে ও।

সহসা জমাদার সেপাইর হাঁকডাক পাওয়া গেল। কেসটেবিলের মেট পাহারা নিজের নিজের পোষাকগুলো টেনেটুনে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহড়া সেরে জল্লাদ বুঝি খেতে গেছিল। খেয়ে দেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে এসেছে।

যাদের দেখার কথা তারা বুঝি শেষ বারের মত টিকটিকির নাটবল্টুগুলো আর এক বার দেখে নিল।

ওরা এসে গেল।

মিলিটারি কায়দায় কুচকাওয়াজে, সবুট পায়ের ঠক ঠক শব্দ তুলে ওরা এল। সুপার ডিপুটি সুপার জেলার ডিপুটি জেলার সুবেদার, জমাদার, আরো কত পার্শ্বচর।

ওরা দাঁড়াল টিকটিকিটার কাছে। ডিউটি জমদার সুবেদার, অতঃপর জেলার। সকলের মুখ থেকেই সুপার রিপোর্ট শুনল। সকল আয়োজন সুসম্পন্ন। টিকিটিকি তৈরী। জল্লাদ প্রস্তুত। শুনল সুপার এবং যথারীতি ঘাড় নাড়ল। আপন পল্টন নিয়ে পিছিয়ে এল হাত দশেক। দাঁড়াল কেস টেবিলের উঁচু যায়গাটিতে, সারিবদ্ধ হয়ে টিকটিকির সুমুখ বরাবর।

ডানদিকে টিকটিকিটার কাছেই সিভিল সার্জন, দুজন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, রাইটার। রাইটারের হাতে ওষুধের শিশি। ডাক্তারের হাতে লোশনে ভেজা পাতলা কাপড়।

তার নির্দ্দিষ্ট যায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে জল্লাদ, টিকটিকি থেকে হাত পনের দূরে। হাতে ওর লকলকিয়ে উঠছে নতুন বেত। বেতটা বেশ পাকা আর পোক্ত। হয়ত অনেকদিন ধরে তেল মেখে মেখে আরো পোক্ত করা হয়েছে বেতটাকে। তাই বেতের পাকা হলুদ গায়ে সূর্য কিরণ পড়ে যেন আগুনের জিহ্বা লিকলিকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে!

বেত হাতে ওকে কি জল্লাদ বলা চলে? শরীরটা ওর মানুষের মতই। ব্যায়াম করা ভাল-খাওয়া ভাল-পরা সুখে-থাকা মানুষের পেশল শরীর, কিন্তু ওর চোখ দুটো? যেন শ্বাপদ নৃত্য। আর গোঁফজোড়া? যেন ক্রুর উল্লাস। হ্যাঁ, ও যে জল্লাদ আরও একটা চিহ্ন রয়েছে তার। ওর মাথাটা ছাঁচা। কয়েদিরা মাথা ছাঁচতে পারেনা। জল্লাদরা পারে। ওতে গর্দানটা মোটা হয় আর মজবুত হয়। তাই জল্লাদদের জন্য কারা-আইনের ব্যতিক্রম।

জল্লাদের হাতে লোম নেই। তাই ওর হাতের ফোলা ফোলা শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শিরাগুলো যেন ক্রমশই ফুলে ফুলে উঠছে। যে হাতে বেত সে হাতে এবং যে হাতে বেত নেই সে হাতেও। আসলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেনা ও। গেল পনের বছর, যতবারই ফাঁসটা গলায় পরিয়ে দেবার ঠিক আগখানে ওকে অপেক্ষা করতে হয়েছে কয়েক মিনিট বা কয়েক মুহূর্ত, অথবা টিকটিকিতে বাঁধা নরদেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বক্ষণে প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। ঐসময়টা প্রতিবারই ভীষণ অস্থির বোধ করেছে ও। অথচ এটাই সময় যখন হাত পা টান করে রীতিমত এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা।

যার জন্য সকাল ধরে এত সব আয়োজন এবার আনা হল ওকে। এতক্ষণ কেসটেবিলের পাশের ঘরেই বন্ধ করে রাখা হয়েছিল ওকে। দরজা খুলতে নিজেই বেরিয়ে এল। সারা গা উদলা। জামা কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে ওর।

তেমন কেউকেটা নয়, বয়সটা কাঁচাই, কচি বললেও চলে। টিকটিকিটার কাছে এসে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল ছেলেটি।

ছেলেটিকে টিকটিকির উপর চড়িয়ে দিল ওরা। উপুড় করে শুইয়ে দিল। হাত-পাগুলো বেঁধে দিল মোটা খাড়ুর মত সেই লোহার আংটায়।

ব্যটনের নিঃশব্দ সঞ্চালনে কি যেন সংকেত এল সুপারের।

জল্লাদ তৈরী।

মুহূর্তে পনের হাত দূরে পাকা বেত সূর্য কিরণে আগুন ধরাল।

তারপর?

তার পর চোখ বুজতে হয়। কেননা চোখ খুলে দেখা যায়না সেই নৃশংস বর্বরতা।

আস্তানায় ফিরে এসেছে জামসেদ।

আর ওকে পেয়ে খুসিতে উপচে উঠেছে বন্দী শিবির। আলিঙ্গনে চুম্বনে আনন্দিত কোলাহলে বন্দী শিবিরে যেন আজ উৎসবের বান ডেকেছে। কেমন করে কেটেছে জামসেদের কয়েদী মেয়াদ? কেমন করে ও সহ্য করেছে বর্বরতার সেই নৃশংস পীড়ন? এমনি ধারা আরো কত প্রশ্ন, কত কৌতূহলী জিজ্ঞাসা জামসেদকে ঘিরে!

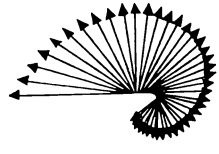

সাতুই মাঘ

দু'বাড়ির প্রতিটি বন্দীর বুকের উপর চেপেছিল যে অদৃশ্য ভার সে ভারটা যেন কিঞ্চিৎ হাল্‌কা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে এখনো সংশয়– সেলিম-ভাই কি সত্যি নিরাময় হয়ে উঠলেন? মনে সন্দেহ আশঙ্কা তবু স্বস্তিও। রোদ বাদলা ভ্রুক্ষেপ না করে উদভ্রান্তের মতন চত্বরে ঘুরে বেড়ান না সেলিমভাই। সজোর পায়চারিতে ঘর কাঁপিয়ে তোলেন না আজকাল। কিছুদিন হল ঘসে ঘসে টাকের ছাল তোলাটাও বন্ধ হয়েছে। দাবার ছকে, তাসের আড্ডায় আর ভলির মাঠে এখন মোটামুটি স্বাভাবিক সেলিম ভাই।

কিন্তু খলিলটা দিনে দিনে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। ওর স্বভাবে আগের মতন তীব্রতা নেই; আবেগটা যেন মন্দীভূত। অবাধ্য চলাফেরা আর কথাবার্তায় যে বেপরোয়া ভাবটা ফুটিয়ে তুলত ও, সেই স্বভাবটাকে কখন গুটিয়ে নিয়েছে ও। ওর কাজকর্ম কথাবার্তা তীব্রতামুক্ত, অসাধারণ সংযত।

খেতে বসে খলিল আর উঠে যায় না। বাটি ছুঁড়ে মারে না। যাকে কিছুতেই সুখাদ্য বলা চলে না সে সব খাদ্যও নিঃশব্দে খেয়ে যায় আজকাল। অনেক পীড়াপীড়ি করেও প্রাতঃভ্রমণে অর্থাৎ ভোর ভোর একটু হেঁটে বেড়ানো চত্বরে-এটুকুতেও রাজি করান যায়নি ওকে। আজকাল সবার আগে লকআপ খোলার সাথে সাথেই এমন কি গ-দার আগেই বেরিয়ে পড়ে ও। ঘড়ি ধরে বেড়ায় পুরো একঘন্টা।

খলিলের গ্রেফতারটা তাহ্‌মিনার কাছে যেমন অকল্পনীয় আঘাত তেমনি ওর কাছেও একটা আচম্বিত ব্যাপার। খলিল প্রস্তুত ছিল না গ্রেফতারের জন্য। গ্রেফতার হবার পরও প্রস্তুত ছিল না অনির্দিষ্ট মেয়াদ আটকের জন্য। ভেবেছিল– ছয় মাস, খুব বেশী হলে এক বছর, এর মাঝেই মুক্তি পেয়ে যাবে। নানা দিক থেকে এরকম একটা আশ্বাসও পেয়েছিল। কিন্তু এক বছরের যায়গায় দুবছর পেরিয়ে আরো কয়েকটা মাস গুজরান হয়ে গেল এখনো মুক্তি পায়নি খলিল। শীগগীর পাবে, আঁকড়ে থাকবার মতো এমন কোন আশা অথবা আশার ক্ষীণতম কোন আলো, তাও দেখছেনা সুমুখে।

যতোই আটকের মেয়াদ বেড়েছে খলিলের ততোই অস্থির, অসহিষ্ণু হয়েছে তাহমিনা। আর খলিল? ছ মাস পর পর আটকের নতুনতর হুকুমনামা এসেছে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে ও। আশাভঙ্গের গ্লানিতেনুইয়ে পড়েনি মুহূর্তের জন্য। অন্তর মাঝে দৃঢ়তার বীজটা উপ্ত হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে। বুঝি ভেতরের সেই দৃঢ়তারই প্রভাব পড়েছে ওর স্বভাবের বাহ্যিক প্রকাশে।

আমি বলি শক্ত হতে গিয়ে কি নিষ্ঠুর হচ্ছনা?

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ আসে। হামেদ ভাই, আপনি বুঝছেন না ব্যাপারটা। আলালের ঘরের দুলালী তাহ্‌মিনা। এরকম মেয়েরা স্বামীদের কাছ থেকে যা চায় এবং পায় সে সবই আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে ও। কিন্তু আপনিই বলুন না, যখন বাইরেও থাকব তখনও সেসব কি আমি দিতে পারব ওকে?

ধৈর্য দিয়ে আদর্শ দিয়ে সেটা ওকে বোঝাও তুমি।

না, বোঝানোর পর্যায় চলে গেছে। ও বুঝবেনা বলেই ঠিক করেছে।

অতএব ওকে ভেসে যেতে দাও আর নিজে চুপচাপ জেলের ভাত খেয়ে চল। এই তো? বিরক্ত হয়েই বললাম।

না, তা নয়, ওর দরকার প্রচণ্ড একটা শক, সাংঘাতিক আঘাত। সেই শক ও পেয়েছে। এখন নিজের পথটা বেছে নেয়া সহজতর হবে ওর পক্ষে। হয় আমাকে ভালবাসবে, আমার সাথে একাকার হয়ে দুঃখকষ্টের পথেই পাড়ি দেবে। নতুবা এখন সময় থাকতেই অন্য কোন মনের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। মোটে তো আট মাসের দাম্পত্য জীবন, একটি মাত্র ছেলে।

ইচ্ছে হয়েছিল বলি, ঠোঁটের ডগায় এসেও গেছিল, এ সব কথা এমন হাল্কাভাবে কেমন করে বলতে পার খলিল? কিন্তু কথাটা বলতে পারিনে খলিলের প্রত্যয়ব্যঞ্জক মুখের দিকে তাকিয়ে। ও যা করেছে তাতে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সংশয় নেই ওর। স্বভাবটাকে কেমন করে এতো দ্রুত বদলে ফেলল খলিল? ভেবে আমি অবাক হই। কারাগারের এই কটি বছরে আপনাকে অবিশ্বাস্য ভাবেই ঢেলে সাজিয়েছে খলিল। আবেগকেন্দ্রিক স্বভাবের দুর্বলতাগুলো ছেঁটে ফেলে এমন এক সচলতার ধ্যান এসেছে ওর মাঝে যা অনেকেই ভাবতে পারেনি, আর ওর স্বাভাবিক কোমলতার সাথে এই শক্তির মিশণটুকু সুন্দর আর আকর্ষণীয় একটা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে ওকে।

কালামের বলা একটা পুরানো কথা মনে পড়ল। কালাম বলত, কারাগার কষ্ঠিপাথর। এই কষ্ঠিপাথরে মানুষের সত্যিকার মূল্য যাচাই। এখানে সত্যধানী, জীবনসন্ধানীর সাধনার পরীক্ষা। কারাগার দেশপ্রেমিকদের মহাবিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের কঠিন পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ তারাই খাঁটি সোনা।

কালামের অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মতন এ কথাগুলোরও সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়অঙ্গম করা অথবা যাচাই করে নেয়া কোনদিন সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। কেননা আপনার হাজারো দুর্বলতা নিয়ে কি বাইরে কি কারাগারে নিজের মাঝেই সংকুচিত থাকি সারাক্ষণ। অন্যদের বিচার করার মতন দুঃসাহস দেখাতে পারিনি কখনো।

কিন্তু আমি দেখেছি কারাগার কেড়ে নেয় মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষকে করে দুর্বল। তেমনি দেখেছি কারাজীবন মানুষকে ধৈর্য তিতিক্ষায় শক্তিতে পৌরুষে মহিমান্বিত করে। খলিল শেষোক্ত দলে। কালামের ভাষায় কারাগারের মহাবিদ্যালয়ে অগ্নিপরীক্ষায় ও সগৌরবে উত্তীর্ণ।

আজো দেখা খলিলের সাথে, শিউলি তলার পাশে যেখানে ছায়া নেই সেখানে বসে উদলা গা রোদ খাচ্ছে। পা ছড়িয়ে বসলাম ওর পাশে। বললাম হৃদয়টাকে পাথর বানিয়ে দেশোদ্ধারে এগুনো যায় এমন তো দেখলাম না। তাছাড়া যে হৃদয় দিয়ে তুমি জয় করবে সেই হৃদয়টাই যদি–

শেষ করতে পারলাম না কথাটা। ছড়তোলা তারের মতো টং করে বেজে উঠল খলিল। জানেন সে কি লিখেছে? ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল খলিল। টেনে নিল শিউলি ডালে টাঙ্গিয়ে রাখা সার্টটা। সার্টের পকেট থেকে বের করল একখানা চিঠি। চিঠিটা মেলে ধরল আমার চোখের সুমুখে। দেখুন না কি লিখেছে। দেখলাম। গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লিখেছে তাহমিনা।

কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে তুমি পড়ে থাক জেলে? তোমার বৌ তোমার ছেলে অপরের আশ্রয়ে অপরের অন্নে কোন রকমে জীবন ধারণ করে চলেছে। এতে কি তোমার পুরুষ মর্যাদা খুব বাড়ছে মনে কর? বলতে পার আপন ভাই আপন বোন– ওরা কেন পর হতে যাবেন? মানলাম। কিন্তু লজ্জাশরম তো আমার লোপ পায় নি এখনো। একদিন নয় দুদিন নয় বছরের পর বছর কেমন করে আমি হাত পাতি ওদের কাছে? একটা সখের জিনিস কিনবো, একটা জামা

কিনবো বাচ্চার জন্য– আমাকে হাত পাততে হবে। যাব বাপের বাড়ি, রিকশা ভাড়া নেই– হাত পাততে হবে। কেন? সামান্য দুটো কি তিনটে টাকার জন্যও কেন আমাকে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়? আমার না বিদ্বান সুপুরুষ উপার্জনক্ষম স্বামী রয়েছে? অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে, আমি বলবো গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা এর চেয়ে লজ্জাকর কিছু আছে কি?

এর চেয়ে মৃতুই শ্রেয়।

আশ্চর্য হই। এ অবস্থাটা আমার নারীর সংকোচে বাধে কিন্তু তোমার পুরুষ মর্যাদায় আঘাত করে না। তাই সরকারী ফৌজের নিরাপদ তত্ত্বাবধানে সরকারীখানায় পেট ভরিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটে তোমার।

কত নতুন মেহমান আসে বাড়িতে। দেখতে চায় আমাকে। নতুন নতুন যায়গায় দাওয়াত পড়ে। আমি পালিয়ে বেড়াই। কেননা নতুন লোক মাত্রেই আমার ভয়। ওরা তো জানে না কিছু। ওরা শুধায় স্বামী কি করেন, কতো মাইনে?

এর জবাবে কী বলব আমি? আমি কি বলব, স্বামী রাজবন্দী, আহার বাসস্থান ফ্রি, মাইনে– ০? রাজবন্দী স্বামীর পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করবে, দুঃখী হয়েও সুখ পাবে, অনাহারী থেকেও তৃপ্তি পাবে তেমন মেয়ে বিয়ে করনি তুমি। এ কথাটা হয়ত মনে থাকে না তোমার। মনে থাকেনা বলেই তুমি রশিদ সাহেবের স্ত্রীর কথাটা লিখতে পেরেছিলে।

আমি জানি রশিদ সাহেবের স্ত্রী অকল্পনীয় দুঃখ কষ্টের ভেতরও শুধু মনের জোরে শুধু দুখানি হাতের শ্রমকে অবলম্বন করে এখনো পাঁচ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে বেঁচে রয়েছেন। আমি এও জানি, পুতুল আর খেলনা বানিয়ে দৈনিক দু'টাকার বেশী আয় হয় না তার। কাজ যে সব সময় পায় এমনও নয়। তবু এই আয়টাকে সম্বল করেই তার এবং মেয়েটির ভরণপোষণ চলে। আবার এর থেকে পয়সা বাঁচিয়ে তোমাদের মতো নন্দদুলালদের জন্য বিড়িসিগারেট, ঘরে তৈরী খাবারও নিয়ে যায় দেখা করার সময়। সবই উত্তম কথা।

রশিদ সাহেবের স্ত্রীর কথাটা অমন ফলাও করে লিখেছিলে কেন বল তো? আমার সুমুখে তাকে আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করতে চাও? তবে আমার কথাটাও শুনে নাও। আমি পারব না। ওরকম কায়ক্লেশে জীবন ধারণ সম্ভব নয় আমাকে দিয়ে।

প্রসঙ্গটা এসে পড়ল বলে আরও একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। সচরাচর যেমন বিয়ে হয় আমাদের সমাজে অর্থাৎ উভয় পক্ষের মুরুব্বিজনদের কথাবার্তার পরিণতি হিসেবেই আমাদের বিয়ে হয়। তবু তোমার আমার সম্মতির প্রশ্নটা যে উঠেনি এমন নয়। তোমার সম্মতি ছিল। আমি শুধাই সম্মতি দেয়ার আগে তোমার সম্যক পরিচয়টা (যে পরিচয়ে তোমাকে কারাবরণ করতে হয়) কি আমাকে জানান উচিত ছিল না? যদি বলি, ইচ্ছে করেই সে সব গোপন রেখেছিলে, সজ্ঞানেই তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, তবে কী জবাব দেবে, শুনি?

তুমি বন্দী, তাই জোর করে কলমটাকে সংযত করলাম। নইলে আরো অনেক কথা আমার বলার এবং লেখার রয়েছে---- রানী আপার কাছে চিঠিতে এত বিষ ঝেড়েছ কেন আমার বিরুদ্ধে? একেই বলে ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারার গোসাই। শোন, অমন করে খুঁচিয়োনা আমায়। কখন কী যে করে বসব, নিজের উপরই আস্থা নেই আমার---।

চিঠিটা শেষ করে ফিরিয়ে দিলাম খলিলের হাতে।

দেখলেন তো? এখন আপনিই বলুন?

বললাম, অন্যায় কী লিখেছে তাহ্‌মিনা।

অন্যায় নয়? আপনি বলছেন কী হামেদ ভাই? অসহায় শৃংখলিত স্বামী প্রতিটি প্রহর যার বেদনার দাহন, তার কাছে এমন চিঠি দেয়া অন্যায় নয়?

কোন মেয়ে– যার আছে হৃদয়, আছে সামান্য একটা মমত্ববোধ সে পারে এমন চিঠি লিখতে অভিমানে ক্ষুব্ধ খলিল।

এটা নতুন কিছু নয়, নীরব থেকে শান্ত হতে দিলাম ওকে।

ঝপ করে দুটো কাক এসে বসল শিউলী ডালে। খসখসিয়ে ঝরে পড়ল একটা শুকনো পাতা, কয়েকটা শুকনো ফুল।

অতি বড় শত্রু, সেও এমন নির্দয় হয় না, হামেদ ভাই। দুশমন যে তার কাছ থেকেও করুণা প্রত্যাশা করে মানুষ। আমি এমন দুর্ভাগা–।

গলাটা যেন বার দুই কপে বুজে এল খলিলের। মুখটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিলও।

কিন্তু খলিল, যে সমাজ থেকে যে চেতনা নিয়ে তোমার ঘর করতে এসেছে তাহ্‌মিনা সেটা হিসেবের মধ্যেই আনছনা তুমি। আমি বলি ঠিক ওর যায়গায় নিজেকে বসিয়ে ওরই চেতনা দিয়ে নিজের অবস্থাটা কল্পনা কর তো তুমি?

আমি কখনো বলতে পারতাম না রজাবন্দী স্বামীর পরিচয় দিতে লজ্জা হয় আমার। কারারুদ্ধ স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলতে পারতাম না নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটে তোমার। চেঁচিয়ে উঠল খলিল।

এতো তোমারই চেতনা দিয়ে দেখা হল, খলিল। আমি বলছি–

আসল কথা দু হাতে টাকা ওড়াতে পারছে না; জাঁক দেখিয়ে বড় বোনের সাথে টেক্কা দিতে পারছে না, এই হল ওর দুঃখ। আমি চিনি না ওকে?

হেসে বললাম, চেনই যখন তখন আর রাগ কর কেন? বলতে পার এসব ছোট ছোট দুঃখ। কিন্তু তাহমিনার সমাজে এগুলোই বড় দুঃখ।

অথচ কোন বাধাই তো আমি রাখিনি ওর সমুখে আমি স্পষ্ট লিখেছি, বলেছিও– সকল বাধ্যবাধকতা থেকেই তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। কিন্তু কথাটাই শুনতে পারেনা ও। এদিকে জ্বালিয়ে মারছে আমায়–।

হঠাৎ থেমে গেল খলিল। মাটির সাথে গা খসখসিয়ে শুকনো পাতাটা গড়িয়ে এসেছে আমাদের দিকে। হাত বাড়িয়ে পাতাটা তুলে নিলো ও। দুমড়িয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে উড়িয়ে দিল বাতাসে।

ওকে এখনো চিঠি দাওনি তুমি। এটা কি অন্যায় হচ্ছে না?

ও কেন খুলনায় গিয়ে বসে আছ? আসতে পারেনা ঢাকায়?

তুমি আসতে লেখ, তবে সে না আসবে ও।

বয়ে গেছে আমার লিখতে। আমি বুঝি রাগ করতে জানি নে?

হাসি চাপা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল আমার পক্ষে। হাসতে হাসতে বললাম, এমন গাল ফুলিয়ে বলছ যেন তাহমিনা সুমুখেই বসে আছে।

ওর ক্ষুব্ধ মনে কোন দাগ কাটে না আমার মুখের হাসি। খাঁটি স্ত্রী নিন্দুকের মতো বলে চলল, রানী আপা লিখেছে, ইদানিং নাকি খানাপিনা একদম ছেড়ে দিয়েছে। কিছু খাবে না, না খেয়েই নাকি মরবে– এই পণ করেছে। ছেলেটার দিকেও তেমন নজর দেয় না। সেই যে বলেছিলাম আপনাকে, ও নিজেও মরবে আর আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে। দেখবেন ঠিক তাই হবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে আশ্বাস দেবার জন্যই বললাম।

হালে আবার নতুন কায়দা ধরেছেন।

কি কায়দা?

দিন কুড়ি ধরে প্রায় রোজই চিঠি পাচ্ছি। রোজই লিখবে, চিঠির আঘাত আঘাতে আমাকে বিধ্বস্ত করবে, এ রকম একটা সংকল্প নিয়েছে মনে হয়। সে কী চিঠি। গণ্ডা গণ্ডা শুধু অভিযোগ, অভিযোগের হাজার ফিরিস্তি, ইনিয়ে বিনিয়ে শুধু আপন দুর্ভোগের কান্না। সত্যি হামেদ ভাই মেয়ে জাতটার উপরই আমি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি। পৌরুষের অভিযাত্রায় ওরা শুধু অমঙ্গল, শুধুই পিছুটান।

মহাকৌতকে এবারও হেসে উঠলাম। বললাম, এত বড় আবিষ্কারটা এখনো লিখে রাখনি খাতায়? ভুলে যাবে যে।

কিন্তু এ কী কাণ্ড খলিলের? ওকি সত্যিই হাসবে না আজ? কালামের মতো খলিলও তো সেই মুষ্টিমেয় দলের; এই বন্দীশালায় যাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা– দুঃখ যতোই গভীর হোক, দুর্যোগ যতোই ভয়ংকর হোক– মুখের হাসি ওদের কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কোনদিন। তবে কি শৃঙ্খলের চেয়েও তীব্রতর যে যন্ত্রণা সেই হাসতে-না-পারার যন্ত্রণা খলিলকেও পরাস্ত করেছে?

বন্দী প্রাণ মমতার সামান্যতম পরশটুকুর জন্য কাঙ্গাল হয়ে চেয়ে থাকে একথাটা যে বোঝেনা তার চেয়ে হৃদয়-হীনা আর কেউ আছে এ পৃথিবীতে? এই যে আটক থাকা বছরের পর বছর, এর চেয়ে ফাসি যে অনেক শ্রেয়– এ কথাটা কি তাহমিনার মতো মেয়েরা বঝবেনা কোনদিন? আদর্শ বাদ দিন, দেশপ্রেম বাদ দিন, আমার বন্দীত্বের লাঞ্ছনা যে মেয়ের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক করেনা তাকে নিয়ে আমি কী করবো, হামেদ ভাই?

নিজের ভেতরই কেমন চমকে উঠলাম। খলিলের অশ্রু টলমল চোখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম মনে হল আমার তাহমিনার বিরুদ্ধে খলিলের বন্দী হিয়ার যে ফরিয়াদ তার কোন জবাব নেই। তাহমিনা বড় নিষ্ঠুর। তবু কী এক বিশ্বাসের জোরেই যেন চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, ভুল করছ খলিল। ভুল করছ। তাহমিনা তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। ভালবাসে বলেই এমন দুর্জয় অভিমান ওর।

নুতন কথা আর কি বললাম, এমনি একটা প্রশ্নের মতো আমার মুখের দিকে কষিণকাল চেয়ে রইল খলিল। বলল, আপনি তো চিরকালই তাহমিনার পক্ষে। তারপর ধীর পায়ে ঘরের দিকে চলে গেলেও।

উত্তরে হাওয়া এসে আবার ও ঝরিয়ে গেল শিউলি ডালের দুটো শুকনো পাতা।

আঠাশে মাঘ

শীত কালের রাত আমার উপর জবরদস্তি। সন্ধ্যার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে গরাদের কপাট। কড়া নিষেধ– সে আর খোলা যাবেনা রাতের বেলায়। অল্পতেই যাদের ঠাণ্ডা লাগে সেই গ-দা আর সনুমামা ছাড়াও অন্যদেরও আপত্তি, খোলাকপাট দিয়ে হিমেভেজা কনকনে বাতাসের মুক্ত গতি সয়না ওদের স্বাস্থ্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম কবি। কবি বলে আকাশকে নির্বাসন দিয়ে কুয়াশা-মোড়া বাতাসের অমন নরম সোহাগের ছোঁয়া বাঁচিয়ে রুদ্ধ কক্ষেই যদি বাঁচতে হয় তবে সে বাঁচার সার্থকতা কি?

কবির প্লরিসি। সামান্য ঠাণ্ডাও ওর পক্ষে বিপদজনক তবু যখন ওর ইচ্ছে জাগে ওর মাথার কাছে কপাটটা ধড়াস করে খুলে ফেলে ও। কেউ কিছু বলে না। কেননা ওর মুখের একশো মেগাটন বিস্ফোরণকে সকলেরই ভয়। শুধু অ-দা এসে সাবধানী দিয়ে যায়। ওস আসছে, আলোয়ানটা গায়ে প্যাঁচিয়ে নাও।

কবি যা পারে আমি তা পারি না। মুখে অথবা বুকে অতো তাকত নেই আমার। আমি সর্তক নিঃশব্দে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে চোরের মতন আধখানি কপাট খুলি, চুপচাপ বসে থাকি। এ বুদ্ধিটুকুও কবির কাছ থেকেই ধার করা। ও-ই একদা রাত সাড়ে এগারোটায় পুরো কপাটটা খুলে বসেছিল আমার চেয়ারে। বলেছিল, দেখবেন কেউ টের পাবে না। ব্যাপারটা তো একটা বাই, আহেতুক ভয় যদি ঠাণ্ডা লাগে?

কবির কথাটাই ঠিক, কেউ টের পায়নি। অথবা টের পেয়েও আপত্তি করেনি। বদ্ধ অঙ্গনে অপরূপ শীতরাত। জ্যোৎস্না আর কুয়াশায় একাকার। বিচিত্র কুহেলি। যেন দীর্ঘ কোন স্বপ্ন মন্থর গতিতে আপন বিলাসের জাল বুনে চলেছে। জ্যোৎস্না কুয়াশায় রংধরা এই স্বপ্নের ওপরে যে আকাশটা, সে যেন বহুদূরের এক রহস্য। কিছু তার চোখে পড়ে, কিছু বা অ-দেখা। কিছু তার বোঝা যায় কিছু বা দুর্জ্ঞেয়।

গানের জন্য পরিবেশ, মেজাজ এমন কি সরের ও প্রয়োজন পড়ে না কাসেমের। যেমন কথা বলা, হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠা তেমনি ওর গান। কিন্তু

আজও কথা বলছেনা, আজ সত্যিই গান করছে ও। পুরু লোহার শিকের যে দরজা, তার পাশেই ওর সীট। শিকের ফাঁকে চুইয়ে পড়া চাঁদ, শীতে ঢাকা রহস্য রাত্রি, কুয়াশার কুহেলি, সেদিকে চেয়ে গুণগুণিয়ে গান ধরেছেও– তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি------।

বাতাস বইল এক ঝলক। আমার মনে হল ঢেউ খেলে গেল তরল কুয়াসা। আর এক ঝলক বাতাস এল, জ্যোৎস্না কুয়াশায় রংধরা স্বপ্নটাকে যেন তাড়া করে নিয়ে চলল এই কারাগারের বদ্ধ অঙ্গনের বাইরে অন্য জগতে, যেখানে নীঃসীম লোকে আরো হাজার স্বপ্নের মুক্তপক্ষ বিচরণ।

আমার সেই গরাদ-সমান আকাশটুকু সেও আজ রহস্যে ঢাকা। সেখানে আমার সেই প্রিয় তারকাদের খুঁজছি। সহসা পরিচিত পায়ের শ্যাণ্ডেল ঘঁসা উত্তেজিত পদধ্বনি পেয়ে ফিরে চাইলাম।

দ্রুত আর উত্তেজিত পায়ে এলেন সেলিমভাই। কিন্তু বসলেন অতি সন্তর্পণে। যেন খুবই গোপনীয় কিছু প্রকাশ করছেন তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন শোন, ব্যাপারটাকে আর হালকা করে দেখনা। সন্দেহ আমার অমূলক নয়। পুরো দুটি বছর আমি তক্কে তক্কে ছিলাম। আজ হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। আই অ্যাম নাও ডেফিনিট উদ্যাট সি ইজ–

ছিঃ সেলিমভাই! কালাম না আপনাকে বারণ করেছিল? আজকের ইন্টারভিউতেও ফের এসব কথাই আলাপ করেছেন ভাবীর সাথে? ছিঃ! স্বরে এবং মুখে ভর্ৎসনা ঢেলে বললাম।

না, না, আমি কি আলাপ করেছি? সে-ই তো সব বলল। বিধি ওর বাম। ধরা পড়বে আজ, নইলে কেন অনাহূত এসব কথা বলতে যাবে?

'এ সব কথায়' না রেগে পারা যায় না। রেগেমেগেই শুধালাম, কী বলেছে।

আরে সে-ই তো মজা। ভেরী ইন্টারেস্টিং। ও লিখেছিল রাত্রে ষ্টিমারে চড়ে পরদিন বেলা দশটায় নাববে ঢাকায়, বিকেলে ইন্টারভিউ সেরে সে রাতেই আবার ফিরতি ষ্টিমার ধরবে। মনে আছে তো তোমার? চিঠিটা যে দেখিয়েছিলাম তোমায়।

হ্যাঁ। মনে আছে।

যাক, সি ইজ নট গোয়িং, সে যাচ্ছেনা। বলেই চোখজোড়া এমন করে পাকিয়ে বললেন সেলিমভাই যেন তার স্ত্রীর এই নট গোয়িং, না যাওয়ার মধ্যেই নিগূঢ় যত তাৎপর্য।

শুধালাম যাচ্ছে না কেমন করে বুঝলেন?

কাল আমার সাথে দেখা করছে যে। অথচ কোন প্রয়োজন নেই দেখা করার।

থাকছেন কোথায়?

সেও আর এক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমাকে তো লিখেছিল থাকবার যায়গা নেই ঢাকায়। কিন্তু থাকবার তার ভাল যায়গাই আছে। কোথায় সেটা তুমি অনায়াসেই বুঝে নিতে পার। কিন্তু আমাকে মিথ্যে করে বলল, থাকবে নাকি এখানকার সেই মেয়েদের হোষ্টেলে। সেখানে ওরই এক সহকর্মী ট্রেনিংয়ে এসে থাকছে। ফু-ল। একেবারে বো-কা, বোঝেনা হাওয়া খেয়ে এতো বড়টি হইনি আমি। আমার চোখে ধুলো দিতে চায়। বুঝলে না? গত দুইটি বছর তক্কে তক্কে ছিলাম। ধরতে পারিনি। বড় চালাক মেয়ে। কিন্তু অবশেষে ধরা পড়ল। আমার আফসোস ধরা পড়ল তো এমন বোকার মতন ধরা পড়ল কেন?

রূঢ় হচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না সেলিমভাই। কিন্তু আগেও বলছি আমি, আজও বলছি, এ সবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা।

কল্পনা? জ্বলজ্বলে চোখে আমাকে যেন ভস্ম করে বললেন সেলিমভাই। বললেন ফের– ফ্যাকট্‌স, মানে ঘটনা কী বলছে? প্রথমতঃ একদিন বেশি থাকছেও। সে আমার সাথে দেখা করার জন্য নয়, যদিও মুখে তাই বলেছেও। দ্বিতীয়তঃ তাই যদি হবে তবে চিঠিতে এই থাকার কথাটা সে গোপন করেছিল কেন? তৃতীয়তঃ সে যে এক্সকিউজ মানে কারণ দেখিয়েছে অর্থাৎ পরীক্ষার খাতার ব্যাপার ওকে থাকতে হচ্ছে, ইট ইজ এ লাই, এটা মিথ্যা–।

কখন গান থেমে গেছে কাসেমের। গভীর হয়েছে রাত। সবাই ঘুমিয়ে। সে সব বলে চিল্লিয়ে উঠলাম– পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আর সবাই মিথ্যুক, এই আপনার ধারণা, না? সেলিমভাই নির্বিকার। নিজের কথাই বলে চলেছেন তিনি আমি স্থির নিশ্চিত শুধু এবারই নয়, যতবারই ও এসেছে ঢাকায় আমার সাথে

দেখা করতে প্রতিবারই দু'চারদিন বাড়তি থেকে গেছে। শুধু তাই নয়। বিশেষ কাজে সে এমনিতেই এসেছে ঢাকায়। এ্যাণ্ড দ্যাট কাজিন অব মাইন, যার কথা বলেছি তোমাকে সে হচ্ছে ওর দোসর। আমার কোন সন্দেহ নেই।

আমি মনে করি সমস্ত সন্দেহই আপনার অমূলক। দৃঢ়তার সাথেই বললাম।

অমূলক? নো, মনে আছে, আমি লিখেছিলাম ওই ছোকরাটাকে বের করে দাও বাড়ী থেকে? কেন লিখেছিলাম? ছোকরাটা চরিত্রহীন এ আমি জানি। আর এই মহিলা কি জবাব দিয়েছে জানো?

জানি বাড়ীতে শুধু ভাবী আর আপনার মা, পুরুষ বলতে কেউ-ই নেই। একজন পুরুষ থাকা দরকার। এ কথা লিখেছেন ভাবী।

লক্ষ্য কর শব্দটা 'দরকার'। একজন পুরুষ থাকা দরকার। কিসের দরকার বুঝলে তো?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কানে আঙ্গুল দিলাম। ক্ষোভে রাগে বুঝি কান্না আসছে আমার। কান্নার মতোই বুঝি ভেংগে পড়ল আমার কণ্ঠটা। সেলিম ভাই, দোহাই আপনার। এমন সন্দেহ মনের দূরতম কোণেও স্থান দেবেন না। ফুলের মতন নিঃস্কৃষ চরিত্র রাণু ভাবীর, অচলা তার ভক্তি, অটল তার নিষ্ঠা। আমিতো তাকে নিকট থেকেই দেখেছি সেলিমভাই।

দুজনারই গলার আওয়াজটা চড়ে গেছিল। কেউ কেউ ঘুম ভেঙ্গে কেশে হাই তুলে বিরক্তিটা আমাদের কানে আনবার চেষ্টা করছেন। তারাই বোধ হয় কালামকে জাগিয়ে দিল।

ঘুম ঘুম চোখেই হনহনিয়ে এল কালাম। সেলিমভাইর হাতটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল তাকে। ধমকে উঠল– বিছানা ছেড়ে এখানে আসতে বলেছে কে আপনাকে? যা-ন বিছানায়।

কালামের ধমক খেয়ে বাধ্য ছেলের মতই সুড়সুড় করে চলে গেলেন সেলিমভাই। নিঃসন্দেহ হলাম সুস্থ হননি সেলিমভাই। মনের জগতে মাকড়সার মতন সন্দেহের জাল বুনে বুনে ক্রমাগত অবনতির দিকেই চলেছেন। বাহ্যিক প্রশান্তিটা একান্তভাবেই বাহ্যিক এবং সাময়িক।

সচরাচর যা করি না, আজ তাই করেছি। রূঢ় ব্যবহার করেছি সেলিম-ভাইর

সাথে। নিকৃষ্টতম দোষী আর অপরাধী মনে হল নিজেকে। উঠে পড়লাম। কালামের সীটের দিকে গেলাম। সীটে নেই কালাম। কপাটহীন লোহার শিকের দরজাটার উপর পা রেখে বসে আছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম ওর পাশে। বাইরে জ্যোৎস্না কুয়াশার রংধরা শীতের রাত ঢলে পড়া প্রহরে আরও স্তব্ধ আরও নিঝ্ঝুম। গুমটি ঘরের আলোটাও বুঝি কুয়াশার বোরখায় আজ প্রচ্ছন্ন এক রহস্য।

রানু ভাবীর কথাই মনে পড়ে। সারাদিনের মাষ্টারী, সন্ধ্যারাত্রির ট্যুশানি, পরিশ্রান্ত দিনের শেষে রাণুভাবী হয়ত এখন ঘুমে অচেতন। রাণুভাবী জানে না, হয়ত কোনদিনই জানবেনা এই পৃথিবীতে তার প্রিয়তম মানুষটি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কী নিষ্ঠুর অপবাদ তার উপর চাপিয়ে দিল। কিন্তু রাণুভাবী যেদিন জানতে পারবে সেদিন কি ক্ষমা করে দেবে সেলিমভাইকে? আমি জানি রাণুভাবী ক্ষমা করবে। কেননা আকাশের মতই উদার রাণুভাবীর মন, এই পৃথিবীর আলো বাতাসের মতই অফুরন্ত তার ভালবাসার উৎস।

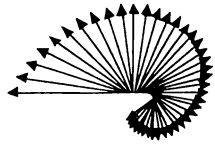

তেসরা ফালগুন

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। সাপের গার মতো ঠাণ্ডা সুড়সুড় স্পর্শ পেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। কানে এল ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠ। ঠিক ফিসফিসানি নয়, ঠিক তার চেয়েও নীচু আর অস্পষ্ট কোন মানুষ কণ্ঠ, কিছুই তার বোঝা যায় না। ভয় ভয় করে কেমন কাঁটা দিয়ে গেল গাটা। ভয়ার্ত স্বরেই শুধালাম, কে?

যাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন তিনি এবার একেবারেই নিঃশব্দ হলেন। শুধু আমার জামাটা ধরে আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে। চোখ কচলিয়ে দেখলাম সেলিমভাই।

কী ব্যাপার, আশ্চর্য হয়েই শুধালাম।

নিরুত্তরে এবারও জামার হাতাটা ধরে টানলেন সেলিমভাই। কী যেন বললেন ইসারায়। পা বাড়ালেন তারই সীটের দিকে। মশারি থেকে বেরিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম নিঃশব্দে।

সেলিমভাইর সীটে এসে দেখলাম ফেলা রয়েছে তার মশারি। চেয়ারটা টেবিলের লাগ। টেবিলের উপর জ্বলছে শেড দেয়া হ্যারিকেন। বুঝলাম কালামের ভয়ে মশারিটা ফেলে হয়তো শুয়ে পড়েছিলেন সেলিমভাই। কালাম ঘুমিয়ে পড়ার পরই উঠে বাতি জ্বালিয়ে বসেছিলেন অথবা চিঠি লিখছিলেন।

দেখ, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না, তুমিও না কালামও না, আমাকে চেয়ারটা দেখিয়ে নিজে মশারীর কিনারটা ঠেলে বিছানায় বসলেন সেলিমভাই, বলে চললেন, ভাবছ আমি পাগল। আমি আবোল তাবোলা বলি। কিন্তু আমি ডেফিনিট তোমাদের ভাবী–।

হা কপাল! এই বাসি কথাটা বলার জন্যই এত রাতে ঘুম থেকে তুলে এনেছেন? চটেছি, চেষ্টা করেও সেটা চেপে রাখতে পারলাম না।

স্তব্ধ, কিছুটা ক্ষুণ্ণ চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রহলেন সেলিমভাই। জরুরী তাগিদ বোধেই ঘুম ভাঙ্গিয়ে টেনে এনেছেন আমায়। কিন্তু বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসব আমি, সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বুঝি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু একটা

বলতে যাচ্ছিলেন সেলিমভাই। কিন্তু তার আগেই আমি গলা তুলে ফেলেছি, আশ্চর্য, অনেক পাগলামো দেখেছি মানুষের, কতো পাগলামোর কথা শুনেছি, কিন্তু আপন স্ত্রী সম্পর্কে এমন অবসেশন, এ রকমটি শুনিনি কোনদিন।

থামো। খুব লেকচার মারছ। ভাবছ আমি পাগল অতএব যা খুসি তাই বলতে পারো। বাট আই সে– নো, আমি বলছি, এসব চলবে না। আমি জানি বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল আমাকে ঘিরে। সেই ডাইনী,– যাকে বিয়ে করার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল আমার–সেই ডাইনী এ চক্রান্তের প্রধান হোত্রী। আর ওই যে খোদাইখাসিটা– ওই গ-দা এ্যাণ্ড অল অব ইউ, তোমরা সবাই– এ চক্রান্তের দোসর। নেই কে? শুধু কালাম। হি ইজ এ ক্লিন ম্যান, যাকে বলা চলে নিখুঁত মানুষ।

প্রমাদ গুণলাম। এই নিশুতি রাতে বুঝি গোটা জেলখানাটাই জাগিয়ে তুলবেন সেলিমভাই। পানির মতো নরম হয়ে বললাম, আপনি ভুল বুঝছেন সেলিম ভাই। আমি তো কখনো গ-দার দলে ছিলাম না?

ঠিক? যেন সন্দেহ নিরসনের জন্যই চোখ দুটোকে কোন সত্য শলাকার মতন তীক্ষ্ণ করে শরীর ফুঁড়ে আমারই অন্তরলোকে পাঠিয়ে দিলেন সেলিমভাই। আমার ভেতরটা দেখে নিলেন। মনে হল পুরোপুরি নিঃসন্দেহ না হলেও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। বললেন, তবে শোন। ওই মহিলাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম– সাইকো থেরাপী হল ভুয়োদর্শন। সাইকো এ্যানালিসিস হল বিজ্ঞান। অতএব সাইকোলজি সাইকো থেরাপী এসব বাদ দিয়ে সাইকো এ্যানালিসিস কর। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু জানো? সে মহিলা শুনল না আমার কথা। এখন সে নিজেই সাইকোলজির শিকার। বুঝলে ব্যাপারটা?

বিন্দু বিসর্গ না বুঝেও ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম– বুঝেছি।

সেদিন একটা প্রশ্ন করেছিলে তুমি। তোমার ভাবী অর্থাৎ মাই ওয়াইফ, সে যদি নষ্টই হয়ে যাবে; যদি ভীড়েই যাবে শত্রুপক্ষে তবে কেন দেখা করতে আসে আমার সাথে? কেন কষ্টার্জিত টাকা জমিয়ে জমিয়ে উপহার কেনে উপহার পাঠায় আমার জন্য? কেন বেদনার ভাষায় চিঠি লেখে, দীর্ঘ সুদীর্ঘ চিঠি, ঘন ঘন– হপ্তায় তিনবার?

কবেকার শুধনো আমার সেই প্রশ্নটা অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করে স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন সেলিমভাই। চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মুখের ভেতর কেমন অদ্ভুত করে হাসলেন। আমার মনে হল হাসি নয়; প্রেত-লোকের কোন অশরীরীর চাপা আক্রোশ। নৈশরাত্রির নিঝ্ঝুম স্তব্ধতায় ভয় জাগানো এক হুমকি। ভয়ের শিরশিরানি জাগল সর্বাঙ্গে। চেয়ে দেখলাম, হাতের লোমগুলো আমার কখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতর এতগুলো মানুষের মাঝে এমন করে ভয় পাইনি কোন দিন। ভয়টাকে তাড়ানোর জন্যই বলে উঠলাম, কী হয়েছে আপনার সেলিমভাই? অমন চোখ করে কী দেখছেন?

আশ্চর্য। মুর্হূতে কেমন স্বাভাবিক হয়ে এলেন সেলিমভাই। মাথা দুলিয়ে একান্ত সহজ ভাবে হাসলেন। বললেন– ওহে বালক, দীন দুনিয়ায় কিছুই জান না এখনো। ছিনাল চেন? ছিনাল?

বললাম চিনি।

ছিনালে পারে না এমন কিছু নেই। এবার পেলে তো তোমার প্রশ্নের জবাব?

কিন্তু তার কী স্বার্থ, সেলিমভাই?

স্বার্থ? নিজে নষ্ট হয়েছে আমাকেও নষ্ট করবে। নিজে পুলিশের স্পাই হয়েছে। আমাকেও স্পাই বানাবে। আমার চরিত্র, আমার জীবন, আমার আর্দশ আমার সব কিছু নষ্ট করেই না সফল ওর চক্রান্ত।

স্তব্ধ বিস্ময়ে বসে থাকি। আপনার রচা উদ্ভট যুক্তি পথ ধরে কোন্ ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় উন্মাদ, এমন দ্বিতীয় নজির জানা ছিল না আমার।

যাক, যে জন্য তোমাকে ডেকে আনলাম– এ চিঠিগুলো পড়।

এতক্ষণ নজর পড়েনি। সেলিমভাইর চোখ অনুসরণ করে দেখলাম হ্যারিকেনটার সুমুখে কতগুলো খোলা চিঠি। লাগলাগ সাজান, বুঝি মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ছিলেন সেলিমভাই। এর আগেও ভাবীর কতগুলো চিঠি জবরদস্তি আমাকে দিয়ে পড়িয়েছিলেন সেলিমভাই। স্বামীর নিকট লেখা বধূর একান্ত ব্যক্তিগত পত্র– ব্যথাতুর হৃদয়ের সহস্র আকুতি, বোবা কান্নায় মাথা কুটে মরা কত সংগোপন বাসনা, যা অন্যের জানার জন্য নয়, পড়ার জন্য নয়। চিঠি পড়তে

পড়তে লজ্জায় সংকোচে অধোবদন হয়েছি, অধমতম অপরাধী মনে করেছি নিজেকে। তবু পড়তে হয়েছে। আজ প্রবৃত্তি হল না। বললাম, এখন থাক সেলিমভাই, আর একদিন পড়ে নেব।

আতঙ্কিতের মতনই চেঁচিয়ে উঠলেন সেলিমভাই, না না এখুনি পড়তে হবে। ইট ইজ ভেরি ইমপর্‌টেন্ট হামেদ। ও তো শুধু আমাকে বিট্রে করেই থামবে না, ওযে সবাইকে বিট্রে করবে। তুমি বুঝছ না? এযে বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল। উঁহু, কিছুতেই আর দেরী করা যায় না। দেরী মানেই সর্বনাশ। শীগগীরই আমাদের একটা ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বাইরের বন্ধুদের সেটা জানিয়ে দিতে হবে। উঁহু, কিছুতেই আর বিলম্ব করা যায় না।

বুঝলাম রেহাই নেই। অতএব চোয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে চিঠির দিকে মনোযোগী হলাম।

আমার সুবিধের জন্য সেলিমভাই নিজেই অগ্রণী হলেন। বললেন বিশেষ জায়গাগুলো দাগ দিয়ে রেখেছি। এগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়। একটা মজার জিনিষ লক্ষ্য করবে। সব চিঠিতেই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এককথা। কথাটা শেষ করে যেন এই ঘরেরই তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে মাথা দোলালেন সেলিমভাই। তারপর মুখের ভেতর দাঁতে দাত চেপে সেই উন্মাদ হাসিটা হেসে চললেন।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শুধু রক্ত জমাট করেনা, শুধু ভয় জাগায়না এ হাসি। এ হাসিতে অরুন্তুদ বেদনার ইতিহাস। এ হাসি সইতে পারিনা।

চোখ বুলিয়ে চলেছি চিঠির উপর। আগের যে চিঠিগুলো পড়েছিলাম তার চেয়ে তফাত নেই বিশেষ। সব চিঠিরই একই সুর, বিরহিণী বধূর ব্যাকুল কান্না আর একটি স্থির বিশ্বাস– আজ হোক কাল হোক প্রিয়তম তার ফিরে আসবেই, প্রিয়তমের মুখখানি বুকে জড়িয়ে সুখাবেশে চোখ বুজবে রানুভাবী।

হঠাৎ আমাকে ঠেলে চিঠিগুলোর উপর নিজে ঝুঁকে পড়লেন সেলিমভাই। এই যে লিখেছে– "আমার অসুখ বিসুখ, অর্থকষ্ট শারীরিক কষ্ট বা অসুবিধের কথা মোটেই ভেবনা তুমি। যখন যতবার খুসি আমাকে দেখতে ইচ্ছে করে, লিখবে। সকল কষ্ট অগ্রহ কবেই আমি উপস্থিত হব। এই যে "শারীরিক কষ্ট" এর অর্থ কী?

এই যে এখানে লিখেছে– তুমি তো জান তোমাকে আমি কী চোখে দেখি।" এটা যে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে পারছ?

এই চিঠিতে এসো। তুমি ভালো থেকো– (ড্যাস), কেন এই ড্যাস? এর পরের লাইনটা দেখ কেমন করে যে আমার দিন কাটে সে কি তুমি বোঝনা–? (ড্যাশ) এখানেও ড্যাশ কেন?

এই যে এখানে দেখ। কী লিখেছে? "–আমার জন্য চিন্তা করনা তুমি। অযথা চিন্তায় মনের উপর কষ্ট নেবে, শরীর খারাপ করবে–"। লক্ষ্য কর, এখানে দুটো ড্যাশ, প্রথমে এবং শেষে। তুমি কি মনে কর না, এই দুটো ড্যাশ ভেরি সিগনিফিকেন্ট, গভীর ইঙ্গিতময়?

বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। মনোবৈকল্যে ভুগছেন সেলিমভাই, এটাই জানি। কিন্তু মাথাটা তাঁর ঠিক ঠিক কতটা খারাপ হয়েছে সেটা বুঝি জানা ছিলনা। আজ জানলাম।

গেটের পেটা ঘড়িতে রাত তিনটে বাজল। কিন্তু ঘুমোনোর উপায় নেই। একমাত্র ত্রাণকর্তা কালাম। এত কথায়ও আজ ঘুম ভাঙছেনা ওর। নিজের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। মরিয়া হয়েই বলে উঠলাম। সেলিমভাই, কালাম যেন জেগে উঠেছে মনে হয়–

এ্যাঁ, ঘুম ভেঙ্গে গেছে ওর? জোকের মুখে চুন পড়লে যেমনটি হয় তেমনি অবস্থা সেলিমভাইর। কোন দিকে দৃকপাত না করে সা–ট করে চলে গেলেন মশারির ভেতর।

হ্যারিকেনটা নিবিয়ে ফিরে এলাম নিজের বিছানায়।

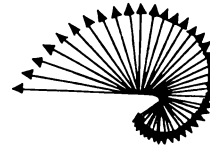

আঠারোই ফাল্গুন

ফাল্গুন মাসে ঝড় উঠেছে।

ফাল্গুন মাসে আকাশে মেঘ জমে, বৃষ্টি নামে, তুফান ছোটে, এ কথা জানা ছিলনা। এমনটি দেখিনি।

আরে এর নাম বাংলাদেশ। কখন ঝড় উঠবে কেউ কি বলতে পারে? প্রশস্ত চিবুকে সর্বজ্ঞের হাসি ছড়িয়ে টেনে টেনে বলেন গ-দা।

হাঁপানীর রোগী অ-দা। মেঘের আলামত দেখেই কাঁথা গায়ে বিছানা নিয়েছেন। বিছানা থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, ওহে হামেদ। পাগলের সংখ্যা কি আর একজন বাড়ল নাকি, দেখ্‌ত?

জানালাগুলো বন্ধ। শিকের দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বাইরে তুফানের হুটোপুটির মাঝে নির্বিকার দাড়িয়ে কালাম। দুহাত কোমরে রাখা, ওর ভঙ্গি উদ্ধত এবং বেপরোয়া। ঝড় আর বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছে ও। ওর দেখাদেখি রশিদও বেরিয়ে এসেছে। কয়েকদিন আগে একটা গন্ধরাজের কলম লাগিয়েছে ও। তুফানের ঝাপ্টায় নেতিয়ে পড়েছে ছোট্ট কলম। লম্বা কঞ্চি গেঁথে ওটাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল ও।

গত দুদিন ধরে প্লুরিসির ব্যথায় ককিয়ে মরেছে কবি। কিন্তু বৃষ্টি দেখে বুঝি ভুলে গেছে সেই ব্যাথা। সে ও বাইরে। কয়েকটা জিনিয়ার চারা লাগিয়েছিল ও। সেই চারাগুলোর জন্যই মাটির আল তুলে বৃষ্টির পানি ধরে রাখছে।

ওদের কাজে সাহায্য করছে কালাম। আগাছা আর বুনো গাছ উপড়ে শুকনো মাটির অন্তরে বৃষ্টিধারার অবাধ সঞ্চরণের পথে কৃত্রিম বাধাগুলো সরিয়ে দিচ্ছে ও।

এই কালাম, কালাম– আর ভিজিসনে। অসুখ করবে। উঠে আয়। প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকেন গ-দা।

কিন্তু ঝড়ের ডাকে যে ঘর ছাড়ে, মেঘ দেখলে যে ছুটে যায় মাঠে তার কাছে গ-দার সাবধানী হয়ত পৌঁছায় না।

তবু গ-দা চেঁচিয়ে চলেন, ঘরে আয়, ঘরে আয়।

হেসে বললাম, গ-দা কেন আর ঘরে ডাক দেন। আপনার এ গৃহ থেকে ছাড়া পেলেই যে বাঁচি।

বাগান ছেড়ে কালামও এগিয়ে এসেছে চত্বরে। ভ্যাংচি কাটে গ-দার দিকে চেয়ে। আমাকে ডাকে চিল্লিয়ে, এই হতচ্ছাড়া অকালেই বুড়ো হয়েছিস নাকি? ঝড় বাদলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকিস ঘরে?

অক্ষমের ম্লান হাসি হেসে বলি, তোর মতন প্রাণশক্তি কোন কালেই তো ছিলনা আমার। ভিজলেই ঠাণ্ডা লাগবে।

তুফানের তোড়টা কমে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে ছিঁটেভিঁটে। জানালার কাছে একটা হাসুনাহেনার ডাল পুঁতবে কবি। মাটি খুঁড়ে ডাকছে কালামকে। আসি বলে চলে গেল কালাম।

ছিপছিপে গড়ন। বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ আর কী এক প্রাশান্তির দীপ্তি খেলে-যাওয়া উজ্জ্বল একখানি মুখ। এ স্বাস্থ্য, এ মুখের কোন পরিবর্তন নেই। যেমনটি দেখেছিলাম আঠার বছর আগে আজও অবিকল তেমনি।

এ কেমন করে সম্ভব হয়? বয়স বাড়ে। মানুষ মোটা হয় অথবা রোগা হয়। বয়সের ছাপ পড়ে মুখে, কুঞ্চন জাগে চিবুকে, কপালে জাগে রেখা, পেশী হয় শিথিল। কিন্তু কালামের কোন পরিবর্তন নেই। বয়সকে যেন জয় করেছেও।

শুধু কি বয়স? কত নির্যাতন, কত পীড়ন গেছে ওর উপর দিয়ে! কিন্তু নির্যাতন কোন ক্ষত, কোন দাগ রেখে যেতে পারেনি, না ওর মুখে, নাওর মনে। যন্ত্রণা কখনো কেড়ে নিতে পারেনি ওর মুখের প্রশান্তি, ঠোঁটের হাসি।

আমার কাছ থেকে শুনে আর অন্যদের কাছ থেকে শুনে 'তুমি' ক্লাবের তরুণ সদস্যরা লেগেছিল কালামের পিছনে, সত্যি কালাম ভাই, এ কেমন করে সম্ভব হয়। তুমি এত তরুণ থাক কেমন করে?

নিরুত্তরে হেসেছিল কালাম। তর্কে যেমন একগুঁয়ে হাসিব, তেমনি নাছোড়বান্দা। কোন প্রশ্ন অমীমাংসিত, কোন তর্ক আলোচনা আধ-খেঁচড়া রেখে দিতে ভীষণ গররাজি ও। এগিয়ে এসে সে-ই শুধিয়েছিল, না কালাম ভাই, হাসলে চলবে না। তুমি কী ভাব তুমি কালজয়ী পুরুষ, জরা বার্ধক্য জয় করে নিয়েছ? ও সব বুজুরকি ভড়ং, বললেও বিশ্বেস করছিনে। কথা হল তারুণ্যটা এতকাল ধরে রেখেছ কেমন করে। সিক্রেটটা বল দেখি?

আর বলে দাও এত এত যে অনশন করলে, এত লাঠির বাড়ি, বন্দুক বেয়নেটের গুঁতো খেলে, গুণ্ডার পিট্টি খেলে– সেসব দাগ কোথায় গেল! শুধিয়েছিল মান্নান।

আর বলে দাও, এগারো বছর যে কারারুদ্ধ থাকলে, সেই কারা যন্ত্রণাগুলোকে কোথায় কেমন করে লুকিয়ে রাখলে অথবা মুছে ফেললে। আমাদের এই সিক্রেটটি জানতেই হবে।

"হ্যাঁ, জানতেই হবে। এত ঝড়ঝঞ্ঝা, এত আঘাতের পরও তুমি কেমন করে অনায়াসে প্রশান্তি ছড়িয়ে হাসতে পার? আবারও শুধিয়েছিল হাসিব।

হাসব না? আমার দুঃখ কি? আমি যে আনন্দের পুত্র। নিরানন্দ আমাকে কেমন করে স্পর্শ করবে? নাটকীয় ঢংয়ে উত্তর দিয়ে সেদিনের জিজ্ঞাসাগুলোর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল কালাম।

আনন্দের পুত্র কালাম, মেঘ দেখলে হৃদয় যার নেচে ওঠে, এই ঝড়ো দিনে কে ওকে বেঁধে রাখবে ঘরে?

কিন্তু যে অশ্রুসমুদ্র মন্থন করে এ আনন্দের জন্ম সে ইতিবৃত্ত কি কেউ জানবে কোনদিন?

জানতে হলে ফিরে যেতে হবে আঠার বছর পিছনে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই অভিজাতিক অট্টালিকায়। আমরা জানতাম কালাম আই সি এস দেবে, এটাই ঠিক করে দেয়া হয়েছে ওর বাড়ি থেকে। অনার্স দিয়েই ও রওনা দেবে প্রভু ইংরেজের দেশে।

এমন সময় আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটে গেল সেইদিনের ভারতবর্ষে। দেশ জুড়ে কী এক রুদ্র-নাচের মাতন লাগল। নতুন ভাষায় কথা কয়ে উঠল লক্ষ কোটি মানুষ। নতুন ভাষায় বলা এ সব কথা শোনার জন্য কান পাততে হয়নি কালামকে। গণদেবতার কণ্ঠ আপনি এসেই জানিয়ে গেল ব্যক্তি জীবনের ওপর অপ্রতিরোধ্য দাবী তার। জানিয়ে গেল ব্যক্তির উপরও রয়েছে দেশ, রয়েছে মানুষ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সমুখেই গুলি চলল। আহত হয়ে হাসপাতালে গেল কালাম। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এল মাস খানেক পর।

বলল, আমারই দেশবাসীর রক্তে হস্ত যাদের রঞ্জিত সেই দেশদ্রোহীদের দলে নাম লেখাতে চেয়েছিলাম, এ লজ্জা, এ কলঙ্ক কেমন করে ঘোচাব?

তারপর ইতিহাস-সেমিনারে অথবা কলেজের লাইব্রেরীতে কদাচিৎ দেখা যেত ওকে। ওকে দেখা যেত জনস্রোতে, মিছিলের সারিতে। দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি আর অপমান প্রতিশোধের আগুণ হয়ে জ্বলে উঠেছিল ওর তরুণ বুকে।

মনে পড়ছে কলেজে অনেকদিন দেখিনি ওকে। হঠাৎ একদিন একটা বিছানা বগলে নিয়ে আমার মেসে উপস্থিত। বলল, খালি সীট থাকে তো ভাল নইলে তোর চৌকিটাই শেয়ার করতে হবে।

অবাক হয়ে শুধালাম, কেন? তোর বাড়ি, বাবা-মা?

ওদের ফেয়ারওয়েল দিয়ে এসেছি।

অক্সফোর্ড, আই সি এস পরীক্ষা, তার কি হল? আবারও শুধালাম।

ম্লান হেসে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়েছিল কালাম। বলেছিল ধীর-কণ্ঠে, সে পাপ চিন্তা একদিন মনে জেগেছিল। আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি।

জবাব দিয়েছিলাম, পাপ বলছিস কেনরে? তোদের মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরাই তো আই সি এস হয়–

– আই সি এস ফেল করলে পুলিশ। পুলিশও না হতে পারলে ডিপুটি। ডিপুটিগিরি না জুটলে সাবডিপুটি। আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে যোগ করে দিল কালাম। তারপর আমার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টির অঙ্গার ছিঁটিয়ে বলেছিল– ইডিয়ট।

গালি দিচ্ছিস কেন? ক্ষুন্ন কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলাম।

ইডিয়ট, ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা বুঝি ফাঁসি কাঠের পথ চিনতে পারে না?

কথার ইতি টেনে আমার চৌকিটার উপর লম্বা হয়ে চোখ বুজেছিল কালাম।

সেদিন থেকেই বুঝি আনন্দের রাজ্যে অভিষেক হয়েছিল ওর। আনন্দের বর পেয়ে ঘর ছেড়েছিলও । ঘরে আর ফেরা হয় নি ওর।

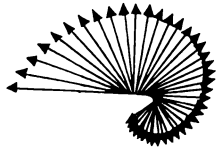

উনত্রিশে ফালগুন

কেবলই দুঃসংবাদ। একের পর এক দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদগুলো যেন আগে আগেই তৈরী হয়েছিল, এখন মিছিল বেঁধে আসতে শুরু করেছে।

অশান্ত অতীশের সকল জিজ্ঞাসা যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছে। অনেক দিন থেকেই পেটের ব্যারামে ভুগছিল অশোকা। কিছুদিন হল অন্ত্রে ঘা ধরা পড়েছে। সিপি করেছে কিছুই হয় নি। ডাক্তারের পরামর্শ, অপারেশন করতেই হবে। অতীশ কি বলে তাই জানতে চেয়েছে অশোকা– সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় পলে পলে হৃদয়ের মাধুর্য ঢেলে যে স্বপ্নকে লালন করেছে চৌদ্দটি বছর, এ জীবনে সেকি স্বপ্নই থেকে যাবে? সবশেষে অশোকা লিখেছে, আজ অতীশকে একান্ত নিকটে পেতে চায় ও। অতীশকে কাছে না পেলে এ রোগের বিরুদ্ধে একক যুঝতে পারবে না ও।

চৌদ্দ বছরে বুঝি এই প্রথম ভালবাসার স্পষ্ট দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে অশোকা।

কিন্তু অতীশের পায়ে যে শেকল! ও কেমন করে উড়ে যাবে অশোকার পাশে? অশোকার চিঠির কী উত্তর দেবে ও! যে প্রশ্নের উত্তর কোনদিনই খুঁজতে হয়নি ওকে, আজ তাই নিয়েই হয়রান ও। অশান্ত অতীশ চুল ছেঁড়ে আর উত্তর খোজে। ও কী করবে! ও কী করতে পারে।

কারাগারেও কোকিল এসেছে; কুহু কুহু মধুর ডাকে জানিয়ে দিচ্ছে বসন্ত এসে গেছে পৃথিবীতে। ঝলকে ঝলকে বসন্ত বাতাস আছড়ে পড়ে গরাদ ভেঙ্গে। কিন্তু বসন্তের হাওয়া নিরানন্দ, বসন্ত বাতাসে আজ দুর্দিনের বারতা।

দুঃসংবাদের এই ঝটকা বাতাসে তথ্য রাজার নিরুপদ্রব সিংহাসনটাও টলে পড়েছে। উড়িয়ে নিয়েছে চারিপাশের পত্র পত্রিকার দেয়াল। কলম হাতে পত্র পত্রিকা আর খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে তথ্যের নিরেট সমুদ্র নিংড়ে নিংড়ে যে রস আহরণ করত মুরাদ আজ সেখানে নিষ্ঠুর এক ছেদ পড়েছে। তথ্যরাজা শুধু সিংহাসনচ্যুত নয়, তথ্যরাজা আজ যেন পথের ভিখিরী। বাড়ী থেকে ছোট বোনদের টেলিগ্রাম পেয়েছে মুরাদ, মাত্র কয়েক মিনিটেই ওদের পরিবারের মুল আলোটি নিভে গেছে।

মুরাদের বাবা ছিলেন মাঝারীগোছের সরকারী চাকুরে। মুরাদ তার একমাত্র ছেলে। মুরাদের ছোট দু'টি বোন, স্কুলে পড়ে ওরা। মা অনেক আগেই এ পৃথিবীর মায়া ছেড়েছেন।

ছোট বোনরা লিখেছে পিতৃমাতৃহীনা ওরা, এ সংসারে এখন ঠাঁই কোথায় ওদের। কে দেবে ওদের আশ্রয়? কোলে মুখে লুকিয়ে কাঁদবে, একটুখানি হালকা করবে বুকের বোঝা এমন একজন আপন লোকও তো নেই ওদের। ওদের আছে একটিমাত্র ভাই। সে ভাই থেকেও নেই কেন?

নিঃশব্দে দু ফোঁটা চোখের পানি ফেলেছে মুরাদ। তারপর গালে হাত রেখে ভাবছে পরিবারের একমাত্র পুরুষ হিসেবে ওর যা কর্তব্য এই কারাগার থেকে কেমন করে পালন করবে সে কর্তব্য!

অ-দার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। দালান আর আসবাবপত্র ছাড়া আর সবই লুট করে নিয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী লিখেছেন, পাঁচসের চাল ছাড়া আর কিছুই রেখে যায় নি ডাকাতের দল। চৈতি ফসল বেচে কিছু টাকা আসবে ঠিকই। কিন্তু তদ্দিন চার ছেলেমেয়ে নিয়ে যে উপোসে মরতে হবে।

খবরটা পেয়ে একটা নৈর্ব্যক্তিক হাসি ফুটেছিল অ-দার মুখে। মন্তব্য করেছিলেন, আমি নেই এই তো সুযোগ ডাকাতদের।

যথা সর্বস্ব গেল ডাকাতের পেটে। বৌদির চলছে উপোস। এতেও যদি না হাসি তবে কেমন করে বোঝাবো আমি যে দেশব্রতে সর্বস্ব ত্যাগী মহাপুরুষ।

কবির খোঁচা খেয়ে আর একটু হাসলেন অ-দা। বললেন, তবে শোন। আমার ঠাকুরদা ছিলেন কোন এক জাঁদরেল জমিদারের শাঁসাল নায়েব। সেকালের নায়েব মানে বুঝতেই পারছ যতো ধড়িবাজ আর ঠগীবাজের রাজা। ধড়িবাজী করে ঠাকুরদা আমার সম্পত্তি কিনে ছিলেন অঢেল মায় ছোট গোছের একটা জমিদারীও। পরবর্তীকালে বাবা-কাকারা ছিলেন ইংরেজ ভক্ত। কেউ হাকিম, কেউবা পুলিশ অফিসার। সুতরাং দিনে দিনে কেঁপে উঠেছিল চুরি বাটপারীর সম্পত্তি।

এতদুর বলে থামলেন অ-দা। কবির মুখের উপর চোখ রেখে যেন বললেন, এবার বুঝলে তো?

কিন্তু কবি বোঝেনি। বিদ্রুপের ঝিলিক হেনে বলল সুতরাং বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে– খুসির খবর– হাসতে হবে। বলিহারি!

এবার পুরোগাল হাসলেন অ-দা। বললেন, ঠিক বলেছ, তস্করের সম্পত্তির অন্ততঃ কিছু অংশ যখন ডাকাতের পেটে যায় তখন বেশ মজা লাগে আমার।

আর ছেলে মেয়ে নিয়ে বৌদি যে উপোসে মরছে? তার কি হবে?

ভাবছ সে ব্যবস্থা করিনি? সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছি বিঘে দুই কি তিন জমি বিক্রি করে দাও। ধান কেনো, বাকী বকেয়া শোধ করে ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে দাও।

ও– বিক্রি? ঠোঁট উল্‌টিয়ে উচ্চারণ করল কবি। আর খলিলের দলটা হেসে ঘর ফাটাল।

অ-দার বিক্রির ব্যাপারটা এখানে মস্ত একটা কৌতুক। পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে অ-দা আটশো বিঘে জমি বেচেছেন। আর বেছেন একশো বত্রিশ ভরি সোনা, চারশো ভরি রুপো, রূপো-কাঁসার রেকাবী অসংখ্য। শুধু বেচতে পারেননি জমিদারীটা। তার আগেই সরকার হুকম দখল করেছে ওটা।

নিজের প্রয়োজনে এই প্রথম বারই সম্পত্তি বিক্রী করতে হল অ-দাকে। এর আগের বিক্রি সবই সেকালের স্বদেশী আর একালের দেশ সেবকদের কাজে।

অ-দা না হয় বিক্রী করলেন জমি। কিন্তু নবীভাই কি করবেন? আটশো তিন বিঘে বিক্রীর পরও সাতাশ বিঘে জমি মজুদ থাকবে অ-বৌদির হাতে। নবীভাইর এক ফোঁটাও জমি নেই। কাজেই বৌ তাঁর ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন গ্রামের পথে। আজই চিঠি পেয়েছেন নবীভাই।

আপত্তি নেই নবীভাইর। মান ইজ্জত চুলোয় যাক। আসল কথা বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকার জন্য চাল চাই। চাল না পেলে খুদ চাই। হোক না ভিক্ষার চাল, ভিক্ষার খুদ। এ যুক্তিটা সজোরে ঘোষণা করেও নীরব হৃদয় জুড়ে যে অরন্তুদ কান্না সেটা কি লুকিয়ে রাখতে পারছেন নবীভাই?

তেসরা চৈত্র

ছবিটার দিকে স্থির নজরে চেয়ে রয়েছে কালাম। ছবির চোখ। তবু সে যেন একজোড়া জোনাকীর স্নিগ্ধ আলো। ছবির চোখও আলো ঝরে। সে দুটি চোখের উপরই স্থির অকম্প্র দৃষ্টি কালামের।

কথা হারিয়েছি। সান্ত্বনার দুটো কথা উচ্চারণ করব, সে শক্তিটা নেই, ভাষাও নেই। বোকার মতো শুধু চেয়ে থাকি। অপলক চোখে দেখি শত সংগ্রামের সৈনিক জীবনের এক কঠিন পরীক্ষাকে সুমুখে নিয়ে বসে আছে নির্বাক।

হিমাকে এখনো বঁচানো যায় না?

নিশ্চয় যায়।

হিমা বলত– আকাশের বিশালতা আর পৃথিবীর সুষমা দিয়ে বিধাতার গড়া এই আশ্চর্য পুরুষ, তাকে আমি ভালবেসেছি। এই আমার গর্ব, এই আমার পরম আনন্দ। আমি আর কি চাই।

বিধাতার গড়া সেই আর্শ্চয পুরুষটি যখন পাশে গিয়ে ডাকবে হিমা, চেয়ে দ্যাখ, আমি এসেছি, হিমা তখন কি চৈতন্য ফিরে পাবে না?

এই ডাকটির জন্যই তো এতকাল কান পেতেছিল হিমা। এ ডাকে যাদু। এ ডাকে ওর প্রাণ। সমস্ত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে এ ডাকে জেগে উঠবে, সাড়া দেবে হিমা।

কিন্তু কালাম কি বলতে পারে কবে কোন লগ্নে এ আহ্বান নিয়ে ও ফিরে যেতে পারবে হিমার পাশে? তদ্দিন হিমার রক্ত মাংসের দেহটার কোন অস্তিত্ব থাকবে?

হিমার আম্মা চিঠি দিয়েছেন কালামকে, লিখেছেন দিন দিন হিমার পাগলামী বেড়েই চলছিল। দিনরাত লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হত। সেই শেকল পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেছে হিমা, এ অবস্থায় বাড়িতে রেখে কোন চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই হিমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পাগলা গারদে।

আনন্দের পুত্র কালাম, ও জানতো এ আঘাত আসবেই। দু'বছর আগে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল হিমা। অনুসন্ধান খোজাখুঁজি সবই ব্যর্থ গেছিল। এক বছর পর নিজেই ফিরে এসেছিল হিমা, কিন্তু কোথায় কেনইবা গেছিল সে কথা কোনদিনই স্মরণে আনতে পারেনি ও।

সেদিন কি উন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরে ফিরছিল হিমা?

সে বেদনার ক্ষত মুছতে না মুছতে এ কী আঘাত পেল কালাম!

হিমার ছবিটার দিকে এখনো নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে কালাম।

ওকে একলা থাকতে দিয়ে নিঃশব্দে উঠে আসি বিছানায়।

খোলা কপাট দিয়ে কিছুই আজ নজরে পড়ে না। শুধু অন্ধকার। নিরেট কালো পাথরের মতো অন্ধকার। এই অন্ধকারের পায়ে মাথা কুটে কেউ কোনদিন আলোর দিশা পায় নি। আপন অন্তরাত্মাকেই ডেকে ডেকে শুধাই, কবে পোহাবে এই শবরা রাত্রি?

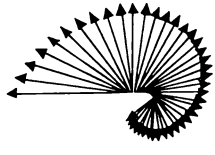

বারোই চৈত্র

এ্যাঁ! একী বলছিস কালাম?

ঠিকই বলছি, এই দ্যাখনা স্লিপ। সবারই নাম আছে।

এক সাথে পঁচিশটি লোকের অফিস কল? কোথায় নিয়ে যাবে রে আমাদের?

সেটা এখনো জানতে পারিনি। তবে এক যায়গায় যাচ্ছি না এটা নিশ্চিত।

এক যায়গায় না?

প্রতিটি বন্দীর মুখে নেমে এল বিষাদের ছায়া। বিষাদে ভরে গেল বন্দীর গৃহ।

গানের ছেলে কাসেম, দৈনিকটা হাতে নিয়ে এ ঘর ও ঘর ছোটাছুটি করছিল। কি নাকি গুরুত্বপর্ণ খবর বেরিয়েছে পত্রিকায়, সেটাই সবাইকে সটীকা পড়ে শোনাচ্ছে।

কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক রকমের গুরুত্বপূর্ণ খবর এসে গেছে কালামের হাতে। খবরটা শুনে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল কাসেম। তারপরই ওর স্বভাবসুলভ উৎফুল্লতায় চেঁচিয়ে উঠল, যার খুসি যে চুলোয় যাক। আমি যাব মার্দান। আঙ্গুর খাব চমনের, মেওয়া খাব কাবুলের, আপেল খাব কাশ্মীরের। আর খাব আখরোট বেদানা কিসমিস। লাল টকটকেটি হয়ে ফিরে আসব এই বাংলা দেশে।

কিন্তু ওর একক উৎফুল্লতার কতটুকুই বা শক্তি। যে বিষাদ নেমে এসেছে সেখানে এই বেপরোয়া আনন্দে ঢংটিকে বরং মনে হয় কৃত্রিম, এমনকি দৃষ্টিকটু।

বুকগুলো কি দুরু দুরু কাঁপছে? কাঁপছে বই কি? এই মুহূর্তে যে পা ফেলতে চলেছি সেই পদক্ষেপ কোথায় কোন তিমির রাজ্যে নিয়ে যাবে, কোন ভয়ংকর অনিশ্চিতি প্রতীক্ষা করে রয়েছে সুমুখে, সেটা যখন অজানা তখন বুকটা দুরু দুরু কাঁপবে বই কি?

অমন যে হাসিব– সদা জাগ্রত আর বেপরোয়া স্বভাবটির জন্য যার নাম জন্ম বিদ্রোহী, সেও তো ছাইয়ের মতো মুখ করে বসে আছে আজ।

মনে কি কোন আশংকা বাসা বেঁধেছে? সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রিয়-বিচ্ছেদের বেদনা। এ বেদনাকে কেমন করে অস্বীকার করি।

কালাম ভাই, যাওনা একবার অফিসে। সে কোথায় যাচ্ছে সেটা না জেনে যে স্বস্তি পাচ্ছি না। বলল হাসিব।

এই তো যাচ্ছি। এগুলো একটু বিলি করে দেই। হাসিবকে আশ্বস্ত করল কালাম। তারপর প্রত্যেকের হাতে হাতে পৌঁছে দিল দুখানি সাদা কাগজ। কার কি জিনিসপত্র তার লিষ্টি তৈরী হবে ও কাগজে।

ইস্, এতদিনের সংসারটা মুহূর্তে ভেঙ্গে যাবে একটি মাত্র কলমের খোঁচায়? খলিলের স্বরে বিচ্ছেদের আর্তি।

কান এড়ায়না গ-দার। ধৈর্য খেলার জন্য তাস বিছাতে বিছাতে বললেন, হুঁ, জেলখানা! তার আবার সংসার!

একটু বাদেই পেয়াদা লস্কর এসে উপস্থিত, পাক্কা খবর শোনা গেল। আমরা পঁচিশজন চার ভাগে ভাগ হয়ে চলেছি বাংলাদেশেরই বিভিন্ন কারাগারে।

এ কেমন রসিকতা, এক যায়গায় এক সাথে যেতাম সেও না হয় বুঝতাম। মান্নান বুঝি তর্ক করার জন্যই তৈরী হচ্ছে।

তোমরা যে যার জিনিষ গুছিয়ে নাও। শেষে নতুন যায়গায় গিয়ে হাল পাবে না। তাম্বি দেয় কালাম।

এই ফালতুরা লেগে যাও। ডাক দিল অ-দা।

খাটের উপর টান হয়ে গান ধরল কাসেম----

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে–
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না।"

চোখ গেল ছাদের দিকে। মন্টুর পায়রাটি চেয়ে রয়েছে– নির্বিকার। এত হুলুস্থুলের কোন অর্থ নেই ওর কাছে। বাইরে চত্বরে খসখসিয়ে হেঁটে চলেছে– শিউলি গাছের মরা পাতা।

আজ ও এসেছে শুকসারি। আর সেই বাচ্চারা, পায়ে আঙ্গুল নেই বলেই যেটাকে হাঁটতে হয় খুঁড়িয়ে, সেও এসেছে।

নাঃ, আর দেরী করা যায় না।

উঠো মুসাফির, বাঁধো গাঠরী। চলো দুর রাহে। মঞ্জিল এখনো অনেক দুর।